ইসলাম বিদ্বেষীদের

অপপ্রচারের জবাব

আবু বকর সিদ্দিকী

ইসলাম বিদ্বেষীদের অপপ্রচারের জবাব

আবু বকর সিদ্দিকী

রিমঝিম প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা

ইসলাম বিদ্বেষীদের
অপপ্রচারের জবাব

আবু বকর সিদ্দিকী

প্রকাশকঃ
আব্দুল কুদ্দুস সা'দী
রিমঝিম প্রকাশনী

প্রকাশকাল
তৃতীয় প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০০২ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং
প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ ইং

প্রচ্ছদঃ
প্রফেসর'স ডিজাইন সেন্টার

কম্পোজ ঃ
প্রফেসর'স কম্পিউটার

মুদ্রণ ঃ
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস

পরিবেশনায় ঃ
প্রফেসর'স বুক কর্ণার
মগবাজার, ঢাকা
ও
খন্দকার প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র

Islam Biddashider Opaprocharar Jabab, Written By-Abu Bakkar Siddique, Published by-Rimzim Publications.
Price Tk. 50.00 Only

উৎসর্গ-

মরহুম আব্বা সেকান্দর আলী মুন্সী

ও

মা রাশেদা খাতুনকে

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। "ইসলাম বিদ্বেষীদের অপপ্রচারের জবাব" বইটি প্রথম প্রকাশের পর থেকেই পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামের বিপক্ষ মহল সাধারণত যেসব বিষয়গুলোর অবতারণা করে পবিত্র ধর্ম ইসলামের উপর কালিমা লেপন তথা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে থাকে- বিশেষ করে ইসলামের দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে অহরহ যেসব প্রশ্নের মুখোমুখি ও বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় এবং ইসলামকে যারা ভালবাসেন কিন্তু প্রকৃত ব্যাখ্যা ও অবস্থা না জানার কারণে এর কোন কোন বিষয় বা বিধি-বিধান নিয়ে সন্দেহ-সংশয়ে ভোগেন- লেখক বইটিতে সাবলিল ভাষায় অত্যন্ত ক্ষুরধার যুক্তির মাধ্যমে সেসব বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করে সকল প্রকার বিভ্রান্তি ও সংশয় অপনোধনে সক্ষম হয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস। ইসলাম যে চিরকালীন ধর্ম, আধুনিক যুগেও এর কোন একটি বিধি-বিধান যুগ অনুপযোগী নয়, সে সত্যও এতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ পর্যন্ত পেপার ব্যাক (চটি বই) ছিল। এবার তৃতীয় মুদ্রণে এসে আরো নতুন বিষয় সংযোজনপূর্বক, বর্ধিত কলেবরে, নতুন আঙ্গিকে ও প্রচ্ছদে এবং সংরক্ষণের সুবিধার্থে উন্নত বোর্ড বাঁধাই ও লেমিনেটিং করে প্রকাশ করা হলো।

লেখকের কথা

মানবতাবর্জিত মানব রচিত মতবাদ, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার ফলে বিশ্বব্যাপী আজ ইসলামী পূণর্জাগরণের যে সুবাতাস প্রবাহিত হতে শুরু করেছে, সে জাগরণী হাওয়া আজ আমাদের দেশেও প্রবাহমান। আর এতেই ইসলাম বিরোধী শক্তি আতংকিত হয়ে প্রবল প্রতিকূল প্রবাহের মুখে 'অপপ্রচার' নামক বালির বাঁধ দিয়ে তা রুখবার ব্যর্থ চেষ্টায় নিয়োজিত। তারা সুমহান আদর্শ ইসলামের বেশ কিছু কল্যাণময় বিধি-বিধানকে বিকৃত ব্যাখ্যা ও বিকৃত প্রচারণার মাধ্যমে মানুষকে–বিশেষ করে যুব ও নারী সমাজকে বিভ্রান্ত করার এক সুনিপূণ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এতে যে তারা কিছুটা সফল হয়নি তা নয়। ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাবহীন এক শ্রেণীর মানুষকে অপপ্রচারের মাধ্যমে অহরহই তারা বিভ্রান্ত করে চলেছে। তাদের এ মিথ্যা ও বিকৃত প্রচারণার মুখোশ উন্মোচন আজ প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই ঈমান ও সময়ের দাবী। সে সুমহান লক্ষ্যেই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। আলোচ্য বিষয়ভিত্তিক প্রায় সবগুলো লেখা সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় 'অপপ্রচার ও বাস্তবতা' শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় মুদ্রণে এসে এ বইয়ের আলোচিত বিষয়গুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তসলিমা নাসরিনের বিকৃতি সম্পর্কে একটি সমালোচনাধর্মী লেখা এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত কিছুটা ভিন্নধর্মী তিনটি নিবন্ধের সমন্বয়ে বর্ধিত কলেবরে নতুন প্রচচ্ছদে বইটি প্রকাশিত হলো।

সূচীপাতা

রিমঝিম প্রকাশনীর কয়েকটি বই

ব্যাভিচারের শাস্তি প্রসঙ্গে

পাপাচার বা ব্যাভিচার এমন একটি জঘন্য ও ঘৃণ্য আচরণ যে, যার অবাধ অনুষ্ঠান মানব সমাজের ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দেয়, পরিবার এবং সমাজ ব্যবস্থায় ধ্বংস ডেকে আনে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে সব জাতি, সমাজ বা সভ্যতার বিনাশ ঘটেছে, এর মূলে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এ পাপাচার। পাপাচার সমাজের নৈতিক ও শান্তিপ্রিয় মানুষদের জন্য এক মহা অভিশাপ হিসেবে দেখা দেয়। পাপাচারের অবাধ অনুষ্ঠান একদিকে যেমন পূতঃ পবিত্র বংশধারায় কালিমা লেপন করে, অপরদিকে এর অনুষ্ঠানে শান্তিপ্রিয় পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থায় সন্দেহ, বিশ্বাসহীনতা, পারিবারিক ভাঙন, নির্যাতন-নিষ্পেষণ, হত্যা-আত্মহত্যার মত জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। এছাড়া অবাধ ব্যাভিচারের ফলে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটিও অকার্যকর হয়ে পড়ে। কেননা, দাম্পত্য সম্পর্ক ও পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ না করেও যদি যৌন লালসা পূরণের সুযোগ-সুবিধা থাকে, তবে এ যৌন লালসা পূরণের জন্য কেউই এত বড় গুরুতর দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের স্কন্ধে চাপিয়ে নিতে প্রস্তুত হতে চাবে না। আর চাইলেও একে টিকিয়ে রাখার জন্য পারস্পরিক সম্পর্কের যে মজবুত বুনিয়াদ রচিত হওয়া প্রয়োজন, পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি বা দম্পতিদের ক্ষেত্রে সে বুনিয়াদ রচিত হতে পারে না বা হওয়া সম্ভবও নয়। আর ব্যাভিচার মানুষকে কল্যাণকামী চিন্তা ও কাজ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে অকল্যাণকর ও অহিতকর চিন্তা-চেতনা ও কাজে জড়িয়ে দেয়। সে কারণে মহান আল্লাহ্‌পাক ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সমাজ থেকে এ অনাচারের মূলোৎপাটন, নিখুঁত বংশ রক্ষা এবং তাঁর প্রিয় বান্দাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নিরুদ্বিগ্ন সুখী জীবন যাপনের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে এ ব্যাভিচারের কঠোর শাস্তি (অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে ১০০টি দোর্‌রা এবং বিবাহিতদের ক্ষেত্রে 'চঙ্গেছার' বা পাথর মেরে হত্যা) ও সামাজিক প্রতিরোধের নির্দেশ দিয়েছেন– যা মানব সমাজের স্থিতি রক্ষা এবং মানবতার মহা কল্যাণের একান্ত স্বার্থেই।

কিন্তু আজ ভোগবাদী ও বস্তুবাদী সভ্যতার ধারক-বাহক তথা ইসলাম বিদ্বেষী মহল মহান আল্লাহ্তায়ালা প্রদত্ত এ কল্যাণকামী বিধানকে এর প্রয়োগ উপযোগী সমাজ ও অন্তর্নিহিত মহৎ লক্ষ্যকে বিচেনায় না এনে এ আইনকে 'বর্বর', 'আধুনিক যুগে অচল' ও 'মধ্যযুগীয় আইন' বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন এবং এভাবে ইসলামের কল্যাণকর বিধান সম্পর্কে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। আসল কথা হলো, একটি অনৈসলামিক, বর্বর সমাজ কাঠামোতে তথাকথিত ভদ্রবেশী বর্বর মানুষদের দৃষ্টিতে একটি কল্যাণকামী বিধানকে 'বর্বর' বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ইসলামী সমাজ কাঠামোতে সুসভ্য, কল্যাণকামী মানুষদের দৃষ্টিতে কোন কল্যাণকামী বিধান বর্বর বলে মনে হতেই পারে না।

আমরা জানি যে, আল্লাহ্তায়ালা প্রদত্ত প্রত্যেকটি আইন বা বিধান একটি ইসলামী সমাজ কাঠামোর আলোকে রচিত এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায়ই তা প্রয়োগ উপযুক্ত, অনৈসলামিক সমাজ নয়। এ আইনটিও একটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনে সে সমাজের উপযোগী করে রচিত, যে সমাজে এ আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বেই ব্যাপকভাবে সংশোধন ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ইসলাম সর্বপ্রথম ব্যক্তির মন ও মনোভাবের সংশোধন করে, তাঁর হৃদয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালার ভয় ও প্রেম জাগ্রত করতে চেষ্টা করে। পরকালে কঠোর জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি এবং সকল প্রকার পাপাচার ও অনাচারের জন্য আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক কঠোর শাস্তির কথা ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, যা কোরান-হাদীসের প্রায় সর্বত্রই পাঠকের সম্মুখে ধ্বনিত হয়ে উঠে। অতঃপর ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য বিবাহ করার সম্ভাব্য সকল প্রকার সহজতর ব্যবস্থা করে দেয়। এক স্ত্রী যথেষ্ট না হলে প্রয়োজনে পুরুষকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের (সর্বোচ্চ চার) অনুমতি দেয়া হয়েছে। দাম্পত্য জীবনে মিলমিশ বা মনঃপূত না হলে পুরুষের জন্য তালাক দেয়ার এবং স্ত্রীর জন্য তালাক লাভের (খোলা) সহজ ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে এবং উভয়কে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পুণরায় পছন্দমত সঙ্গী গ্রহণ করার অনুমতিও রয়েছে। নারী পুরুষকে অবিবাহিত থাকা ইসলাম মোটেও পছন্দ করে না। সেজন্য প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক সামর্থবান নারী-পুরুষের প্রতি বিবাহকে ফরজ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় চরিত্র বিধ্বংসী তথা যেনার উৎসাহ ও উত্তেজনা দানকারী এবং সুযোগ সৃষ্টিকারী সকল প্রকার উপায়-উপকরণের মূলোৎপাটন করা হয়। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনাকে রোধ করে সমাজে শালীন পরিবেশ

সৃষ্টি করা হয় এবং নারী-পুরুষ উভয়কে পর্দা রক্ষা করে চলার ব্যবস্থা করা হয়। এমনি প্রচেষ্টার মাধ্যমে একটি পুতঃ পবিত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই ব্যাভিচারের ফৌজদারী দণ্ড বিধান কার্যকর করা হয়; এর পূর্বে নয়।

সংশোধনের সকল আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যবস্থাপনা কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও যেসব জঘণ্য প্রকৃতির লোক বৈধ-পবিত্র উপায় গ্রহণ না করে কমপক্ষে চারজন লোক দেখতে পায় এমন জনসমক্ষে নির্লজ্জ উপায়ে লালসা পরিতৃপ্তি তথা সমাজকে কলুষিত করবে, তাদের সমাজকে কলুষমুক্ত রাখার স্বার্থে যে কঠোর শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয় তা বিবেকবান ব্যক্তিমাত্রই রায় দিবেন। আর মহান আল্লাহপাকও সমাজের এসব আবর্জনাদের জন্য এ কঠোর শাস্তি বলবৎ করেছেন। এ কঠোর শাস্তির পেছনে আরও একটি লক্ষ্য হলো, ইসলাম একজন চরিত্রহীন ব্যক্তিকে জনসমক্ষে এ শাস্তি প্রদান করে সমাজের অন্যান্য দুশ্চরিত্র তথা এ প্রবণতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মনস্তাত্ত্বিক সংশোধন করে থাকে। যার ফলে খুব সহজে এবং স্বল্প সময়ে এ ধরণের অপরাধ সমাজ থেকে সমূলে নির্মূল করা সম্ভব এবং তা প্রমাণিত সত্য– যা অন্য কোন ব্যবস্থায় সম্ভব নয়।

তবে, লোকেরা এ অপরাধ করতে থাকবে আর ইসলাম মানুষের পেছনে গুপ্তচর লাগিয়ে ধরে এনে শাস্তি দিতে থাকবে, ব্যাপারটা এরকম নয়। এ শাস্তি প্রয়োগের শর্তগুলোকে উপলব্ধি করলে আমরা দেখতে পাবো- তা অত্যন্ত উদার, সুবিবেচনাপ্রসূত এবং অপরাধীকে রক্ষার সকল পথ বন্ধ এমন নিরুপায় অবস্থায়ই শুধু প্রয়োগযোগ্য। ইসলাম চায় কেউ যেন এ অপরাধে লিপ্ত না হয় এবং কাউকে যেন এ অপরাধের শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন দেখা না দেয়।

আমরা জানি, এ শাস্তি প্রয়োগের প্রথম এবং প্রধাণ শর্ত হলো কমপক্ষে ৪ (চার) জন বিশ্বস্ত সাক্ষী থাকতে হবে, যারা স্বচক্ষে নির্ভুলভাবে এ অপকাজ হতে দেখেছে। চার এর কম হলে এ শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। বরং কারো বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তুলবে অথচ তা প্রমাণ করতে ৪ (চার) জন সাক্ষী দাঁড় করাতে পারবে না; তাদেরকে উল্টো আশিটি কোঁড়া মারার বিধান ইসলাম দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্পাক বলেছেন, "আর যারা পবিত্র চরিত্রের স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে যেনার মিথ্যা দোষারোপ করবে, তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারবে, তাদেরকে আশিটি 'কোঁড়া' মারো, আর তাদের সাক্ষ্য কখনও কবুল করো না। তারা নিজেরাই ফাসেক।" (সূরা আন-নূর-৪)।

উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী ইসলাম অপরাধীদের শাস্তি দেয় সত্য, কিন্তু কারো মিথ্যা কল্পিত অপবাদের অভিযোগের ভিত্তিতে যাতে কোন নিরপরাধ ব্যক্তি

শাস্তিযোগ্য না হয়, সে ব্যাপারে একদিকে যেমন অত্যন্ত সজাগ, অন্যদিকে এসব মিথ্যা অভিযোগকারীদেরকেও সমাজে মিথ্যা ও নির্লজ্জতা প্রচার এবং তা থেকে নিবৃত করার লক্ষ্যে ইসলাম কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছে। এছাড়া ইসলামী শরীয়াহ্ অনুযায়ী যেনার ঘটনা ঘটেছে তা যদি সত্যিও হয় এমনকি স্বয়ং বিচারকও প্রত্যক্ষ করে থাকেন তবুও চারজন উপযুক্ত বিশ্বস্ত সাক্ষী ব্যতীত শাস্তি তো দূরের কথা, কেউ তা সমাজে প্রকাশ করুক, ইসলাম তাও পছন্দ করে না। কারণ, এসব অভিযোগের প্রমাণের অভাবে ইসলামী সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের পক্ষে এর শাস্তি প্রদান তথা এ ময়লাকে সমাজ থেকে দূর করা একদিকে যেমন সম্ভব হবে না, অন্যদিকে সমাজের এক কোণে পড়ে থাকা আবর্জনাকে পুরো সমাজে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়ে সমাজে নির্লজ্জতার প্রকাশ ঘটানো হবে। দুশ্চরিত্র লোকেরা কোথায় কোথায় তাদের দুষ্কর্মের ক্ষেত্র রয়েছে তা জেনে যাবে। সে কারণে ইসলাম চায়, হয় উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণ সংগ্রহ করে সমাজ থেকে এ আবর্জনা একেবারে নির্মুল করে ফেলা হোক, নচেৎ যেখানকার আবর্জনা সেখানেই পড়ে থাকুক।

এক্ষেত্রে মদীনার সে মহিলার ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য– যার সম্পর্কে সকলেই জানতো যে, সে চরিত্রহীনা, ব্যাভিচারিনী, তার কাছে লোকজন যাতায়াত করতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে 'যেনার' অকাট্য প্রমাণ ছিল না বলে তাকে কোন শাস্তি দেয়া হয়নি। অথচ তার সম্পর্কে নবী করিম (সাঃ)-এর মুখে এতদূর কথা পর্যন্ত উচ্চারিত হয়েছিল, "অকাট্য প্রমাণ ছাড়াই যদি কাউকে রজমের শাস্তি দেয়ার নীতি গ্রহণ করতাম, তাহলে এ মেয়েলোকটিকে অবশ্যই রজমের শাস্তি দিতাম।" সুতরাং দেখা যায় যে, অকাট্য বিশ্বস্ত সাক্ষী-প্রমাণ ছাড়া এ শাস্তি প্রয়োগ করা যায় না। আর এসব নির্লজ্জ গোপনীয় কাজের ক্ষেত্রে ৪ জন বিশ্বস্ত সাক্ষী তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পাওয়া যেমন সহজ নয়, তেমনি উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হলে অভিযোগকারীকেই ফেঁসে যেতে হয় বিধায় এসব অপরাধের শাস্তি প্রয়োগ যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় খুবই নগণ্য হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এছাড়াও এ শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরও যেসব শর্ত রয়েছে, তা হলো প্রথমতঃ অপরাধীকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। কোন পাগলের ওপর এ শাস্তি প্রয়োগ করা যায় না। কেননা, পাগল নিজের চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করার ব্যবস্থা করতে পারে না। দ্বিতীয়ত ঃ অপরাধীকে পূর্ণ বয়স্ক বালেগ হতে হবে। নাবালেগ এ অপরাধ করলে তাকে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি দেয়া যাবে না। কেননা, পাগলের ন্যায় বালকও নিজের চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারে না। তৃতীয়তঃ শর্ত হলো যে, অপরাধীকে মুসলমান হতে হবে। যদিও এ বিষয়ে ফিকাহ্‌বিদদের

মধ্যে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক (রঃ) একমত হয়ে বলেছেন যে, অমুসলিম বা কাফেরদেরকে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি দেয়া যাবে না। চতুর্থত ঃ শর্ত এই যে, অপরাধীকে স্বাধীন হতে হবে। দাস বা দাসীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার দণ্ড দেয়া যাবে না। দাস বা দাসী যদি বিবাহিত হওয়ার পর যেনার অপরাধ করে, তবে তাকে অবিবাহিত স্বাধীন মহিলার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক (৫০টি বেত্রদণ্ড) দিতে হবে। পঞ্চমত ঃ যেনাকারীকে অপরাধী করার জন্য এটাও জরুরী যে, সে নিজের স্বাধীন মতে একাজ করেছে। জোর-জবরদস্তির কারণে কেউ যদি একাজ করতে বাধ্য হয়, তবে তাকে অপরাধী বা শাস্তিযোগ্য হিসেবে গন্য করা যাবে না। জবরদস্তিমূলক যেনার ক্ষেত্রে কেবল বলাৎকারকারীকেই শাস্তি দেয়া যাবে।

তাছাড়া এ পর্যায়ে নবী করীম (সাঃ)-এর কয়েকটি হাদীসও উল্লেখযোগ্য, যেগুলো রজমের শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামের সহনশীলতা ও উদারতাকে স্পষ্ট করে তোলে। নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "শাস্তিদান এড়িয়ে যাও যতদূরই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।" আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, "মুসলমানদের ব্যাপারে শরীয়তের দণ্ডসমূহ যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখ। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি শাস্তি হতে মুক্তি লাভের কোন পথ পায় তবে তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, শাসকের পক্ষে কাউকে মাফ করে দেয়া ভুল করে শাস্তি দেয়া অপেক্ষা অনেক ভাল।" আবু দাউদ ও নাসায়ী কিতাবের আর একটি হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্ ঘোষিত শাস্তিসমূহ মাফ করে দিতে থাক। কিন্তু শাস্তিযোগ্য যে অপরাধের খবর আমাদের নিকট পৌঁছবে, তার শাস্তির বিধান করা তো তখন ওয়াজিব হয়ে পড়বে।"

এক্ষেত্রে আরো জেনে রাখা আবশ্যক, যেসব লোক কোন ব্যক্তির যেনার অপরাধের কথা জানে, তারা এ খবর শাসক কর্তৃপক্ষের কাছে অবশ্যই পৌঁছাবে বা কোন ব্যক্তি তার নিজের অপরাধ অবশ্যই স্বীকার করবে- এরকম কোন বাধ্যবাধকতা ইসলামী আইন বা শরীয়ত আরোপ করে না। তবে শাসকবৃন্দ যখন কারো এ ধরণের অপরাধের খবর জানবে তখন তা ক্ষমা করার আর কোন সুযোগ থাকে না। এ পর্যায়ে দু'টি ঘটনা উল্লেখযোগ্যঃ

আবু দাউদ শরীফের হাদীস থেকে জানা যায়, মায়েজ ইবনে মালেক আসলামী নামক এক ব্যক্তি যখন যেনার অপরাধ করে বসে, তখন হাজ্জাল ইবনে নোয়াইম তাঁকে বললেন, "তুমি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের এ অপরাধের কথা স্বীকার কর। একথা শুনে সে নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট

নিজের এ অপরাধ স্বীকার করল। তখন নবী করীম (সাঃ) তাকে একদিকে রজমের শাস্তি দিলেন, আর অপরদিকে হাজ্জালকে বললেন, "তুমি যদি তার অপরাধকে লুকিয়ে রাখতে বা প্রকাশ না করতে, তবে এটা তোমার জন্য ভালই হত।"

আরেকটি ঘটনা থেকে জানা যায়, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন এক ব্যক্তি খুব কাতর অবস্থায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর নিকট আসলো এবং এমনভাবে কথা বলতে লাগল যে, তার মুখ থেকে কথা সুস্পষ্টভাবে বের হচ্ছিল না। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, এ ব্যক্তিকে আলাদা এক স্থানে নিয়ে জিজ্ঞেস করুন ব্যাপারটা কি? হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলে লোকটি বললঃ এক ব্যক্তি তার ঘরে মেহমান হিসেবে এসেছিল, সে তার নিজের কন্যার সাথে হারাম কাজ করেছে। হযরত ওমর (রাঃ) শুনে বললেন, "আল্লাহ্ তোমাকে নষ্ট করুক, তুমি তোমার মেয়ের দোষ ঢেকে রাখলে না কেন?" অতঃপর এদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলো। বিচারে উভয়ের উপর শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি জারী করার পর পারস্পরিক বিবাহ দিয়ে দেয়া হল।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, ইসলামী শরীয়ত একটি ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যাপক সংশোধন ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরই মানব জাতির স্থিতি ও মহাকল্যাণের স্বার্থে কতগুলো উদার ও সুবিবেচনাপ্রসূত শর্তের অধীনে শরীয়তের ফৌজদারী দণ্ডবিধিকে কার্যকর করে থাকে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় শরীয়তের এ শাস্তি কার্যকর হওয়ার পর সমাজ যে দ্রুত শান্তি ও কল্যাণের ধারায় ফিরে যেতে বাধ্য, তা প্রমাণিত সত্য। কিন্তু আজ তথাকথিত মানবতার দরদীরা যারা ইসলামের এ কল্যাণকর বিধানকে বর্বর আইন বলে অপপ্রচার চালাচ্ছেন, তাদের চোখ খুলে দেখা উচিত যে, তথাকথিত সভ্য সমাজ ব্যবস্থায়, সভ্য (!) আইনের আড়ালে অবাধ মেলামেশা ও অবাধ যৌনাচারের কারণে কত যে লোমহর্ষক ঘটনা নিত্য সংগঠিত হচ্ছে, নির্যাতিত-নিষ্পেষিত মানবতার ক্রন্দনে আজ আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠছে, হত্যা-আত্মহত্যা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসিডের ছোবলে কত মুখ ঝলসে যাচ্ছে, কত সুখের নীড় পরকীয়া প্রেমের অনলে দাউ দাউ করে জ্বলছে; নীড় ভেঙে ছারখার হচ্ছে। এসব নির্যাতিত-নিষ্পেষিত মানবতার জন্য তাদের দরদ উথলে উঠে না, তথাকথিত সভ্য সমাজ ও সভ্য আইনের অসারতা ও মুখ থুবড়ে পড়া ব্যর্থতাকে দেখেও তাদের বিবেক জাগ্রত হয় না। তাদের দরদ উথলে উঠে তখন, যখন এ

বর্বরতা থেকে মানবতার মুক্তি দানের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত শাশ্বত কল্যাণকর বিধানকে সমাজে প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়, যখন একটি ইসলামী কল্যাণময় সমাজকে অসুস্থ ও অস্থিতিশীল করার জন্য দায়ী কিছু সংখ্যক কুলাঙ্গারকে উপযুক্ত সাক্ষী-প্রমাণ ও ন্যায় বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দেয়ার কথা বলা হয়, তখন তাদের মায়াকান্নার অন্ত থাকে না, শাশ্বত কল্যাণকর আইনকে 'বর্বর আইন' বলে অভিহিত করতে ইতস্তত করে না। কিন্তু তারা একবারও ভেবে দেখে না, একটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক সংশোধন ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও যারা এ জঘণ্য পাপাচারের পথে পা বাড়ায়, এরাই সমাজ ও সভ্যতার শত্রু, মানবতা বিধ্বংসী কীট। এসব মুষ্টিমেয় কীটেরাই সমাজে মানুষের জীবন, সম্ভ্রম ও সুখ-শান্তিকে নস্যাত করে সমাজকে অস্থিতিশীল করে তোলে। এসব কীটদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমেই সমাজ থেকে অনাচার ও পাপাচারের মূলোৎপাটন সম্ভব। মহান আল্লাহ্পাকও ইসলামী সমাজ কাঠামোতে ব্যাভিচারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সম্বলিত বিধান দান করেছেন মানবতার সম্ভ্রম ও নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থেই। যারা এ কল্যাণময় বিধানকে 'বর্বর আইন' বলে অভিহিত করছেন, তারা হয় এ আইনের উপযুক্ত প্রয়োগ ক্ষেত্র ও এর অন্তর্নিহিত কল্যাণধারাকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হচ্ছেন, নচেৎ ইসলাম বিদ্বেষী মানসিকতাই যে এর জন্য দায়ী তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ মহা কল্যাণময় ইসলামের সাথে বিদ্বেষ পোষণের পেছনে অবশ্যই নিহিত রয়েছে কোন গোপন ষড়যন্ত্র ও সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক কূট অভিলাষ– একথা ভাবতে আর কষ্ট হয় না।

চৌর্যবৃত্তির শাস্তি প্রসঙ্গে

একটি ইসলামী সমাজ বা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে মহান আল্লাহপাক মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানে চৌর্যবৃত্তিকে সমাজ থেকে সমূলে উৎপাটনের লক্ষ্যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের বিধান দান করেছেন। পবিত্র কালামে পাকের সূরা 'আল-মায়েদায়' মহান আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, "চোর পুরুষ হউক কি স্ত্রী হোক, উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কর্মফল ও আল্লাহ্‌র নিকট থেকে শিক্ষামূলক শাস্তি বিশেষ। আল্লাহ্‌র শক্তি ও ক্ষমতা সর্বজয়ী ও সর্বপ্রধান, তিনি বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান।'

কিন্তু মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত চৌর্যবৃত্তির উপরোক্ত শাস্তির বিধানটিকে নিয়েও ইসলাম বিদ্বেষী ঐ মহলটি এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, প্রয়োগ উপযুক্ত সমাজ ও ক্ষেত্রকে উপলব্ধি না করে তাদের একই গদবাঁধা নিয়মে 'আধুনিক যুগে অচল' 'মধ্যযুগীয় বর্বর আইন' ইত্যাদি বলে মানুষকে বিভ্রান্তির প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন।

আশ্চর্য হতে হয় এবং দুঃখও লাগে, তাদের তথাকথিত সভ্য যুগের 'সভ্য আইনের' অনিবার্য পরিণতি 'মুখ থুবড়ে পড়া ব্যর্থতায়' সৃষ্ট আজকের নব্য জাহেলীয়াতে দাঁড়িয়ে মানবতার করুন পরিণতি প্রত্যক্ষ করেও তারা মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত শাশ্বত কল্যাণকর বিধানকে, যে বিধান তার চির কল্যাণকর ধারার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় জাহেলী যুগের বর্বর মানুষ সমাজকে অতি অনায়াসে এবং পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে স্বল্প সময়ে সভ্য মানুষ ও সভ্য সমাজে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিল, যে বিধানের ছিটে-ফোটা দু'একটি আইন আজকের কোন কোন দেশ বা সমাজ ব্যবস্থায় টিকে থাকার কারণে পৃথিবীর সবচেয়ে স্বল্প অপরাধের দেশ ও সমাজ হিসেবে স্বীকৃত লাভ করেছে এবং ঐ সমস্ত সমাজের পুরো বছরের অপরাধের সমষ্টির কাছে আজকের পৃথিবীর মোড়ল বলে পরিচিত আধুনিক সভ্যতার দাবিদার দেশের একদিনের অপরাধও হার মানতে বাধ্য হচ্ছে, এমনি একটি কল্যাণকর স্রষ্টা প্রদত্ত শাশ্বত বিধানকে উপহাস ও তিরস্কার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার মত ধৃষ্টতা এখনো তারা দেখাচ্ছে।

আসলে ইসলাম বিদ্বেষী এ মহলটি চির কল্যাণকর সত্য বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট অজ্ঞতার কারণে নতুবা সত্য ও কল্যাণের চির শত্রু ইবলিসী শক্তির বিবেচনাহীন অন্ধ বিরোধীতার কূট-চালে আটকা পড়ে ইবলিসী ক্রীড়ানক সেজেছেন। নচেৎ চির সত্য ও কল্যাণকে চিনতে না পারার এবং বালির বাঁধ দিয়ে প্রবল প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করার হীন চেষ্টার যৌক্তিক কোন কারণ থাকতে পারে না।

আমরা জানি, ইসলামের অন্যান্য বিধানের ন্যায় চৌর্যবৃত্তির এ বিধানটিও একটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন উপযোগী করে মানবতার শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থেই রচিত–অনৈসলামিক সমাজের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য নয়।

একটি ইসলামী সমাজে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ অন্যান্য কর্মসূচীর পাশাপাশি মানুষের নৈতিক ও সামাজিক সংশোধনীর জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ এবং সমাজ থেকে চরিত্র বিধ্বংসী সকল প্রকার উপায়-উপকরণ ও সম্ভাবনার মূলোৎপাটন করে একটি আদর্শ খোদাভীরু সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে অগ্রসর হয়। এছাড়া ইসলামী সমাজে মানুষের মৌলিক মানবিক প্রয়োজনসহ অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের দায়-দায়িত্ব থাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ওপর।

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ যতদিন পর্যন্ত মানুষের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধানে সক্ষম না হয়, ততদিন শরীয়তের দণ্ডবিধি তথা চৌর্যবৃত্তির শরীয়তসম্মত শাস্তিকে কার্যকর করতে পারে না। দারিদ্রের কষাঘাতে বা ক্ষুধার তাড়নায় কেউ চুরির পথ বেছে নিলে শরীয়ত সম্মত শাস্তি দেয়া যায় না। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাঁর খেলাফত আমলে দুর্ভিক্ষের সময় কোন চোরকেই চুরির শাস্তি দেননি। কেননা, তা ছিল ক্ষুধার বছর।

সুতরাং নৈতিকভাবে সংশোধিত একটি ইসলামী খোদাভীরু সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধানের পরই কেবল এ আইন সমাজে প্রয়োগযোগ্য হয়ে উঠে। কারণ, একটি অভাবমুক্ত, সংশোধিত কল্যাণময় সমাজ ব্যবস্থায় বসবাস করেও যারা পাপের পথ তথা চুরির মত ঘৃণ্য পথকে বেছে নেয়- এরা খোদাদ্রোহী, লোভী, শান্তি বিনষ্টকারী এক জঘণ্য চরিত্র; এরাই সমাজ বিধ্বংসী কীট। তারা সমস্যার কারণে নয়, বরং অভ্যাসগত কারণেই পাপ ও অশান্তির পথকে বেছে নেয়। খোদাভীতি, পরকালীন কল্যাণের মোহ, তথা কঠোর শাস্তির ভয় যাদেরকে পাপ থেকে বিরত রাখতে পারে না, এ জঘণ্য অভ্যাগত চরিত্রের অপরাধীদের দুনিয়ার জীবনে নগদ দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি প্রদানের মাধ্যমেই কেবল তাদের এবং এ প্রবণতায় প্রলুব্ধ অন্যান্য অভ্যাসগত অপরাধীদের প্রতিরোধ করা সম্ভব। এটাই স্বল্পতম সময়ে সমাজ থেকে অপরাধ

নির্মূলের একমাত্র সহজতর উপায়। সে কারণেই একমাত্র মহাজ্ঞানী আল্লাহ্পাক চৌর্যবৃত্তিকে প্রতিরোধের লক্ষ্যে একটি সুবিবেচিত শর্তের অধীনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে হস্ত কর্তনের বিধান দান করেছেন। এ বিচারভিত্তিক 'কর্তনকৃত হস্ত' অপরাধীকে তার বাকী জীবনের জন্য একদিকে যেমন একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে, অন্যদিকে সমাজে অন্যান্য অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের সংশোধনে 'এ হস্ত' প্রতিনিয়ত প্রতিরোধমূলক অস্ত্র হিসেবে কাজ করে। সে কারণে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় খুব বেশী সংখ্যক অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার প্রয়োজন হয় না। কিছু সংখ্যক দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলেই সমাজ থেকে দ্রুত অপরাধ বিতাড়িত হয়ে এক শান্তিময় সমাজ হিসেবে গড়ে উঠে, যার প্রমাণ ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস এবং আজকের কোন কোন আংশিক ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা থেকেও পাওয়া যায়।

কিন্তু আজ আল্লাহ্ প্রদত্ত সে কল্যাণময় বিধানের অনুপস্থিতি এবং মানুষের তৈরী আইন-বিধানের ছত্রছায়ায় অপরাধ নির্মূল তো দূরের কথা বরং উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পেয়ে জাহেলী যুগের বর্বরতাকেও হার মানায়, যার প্রমাণ বিশ্বের প্রতিটি দেশ বা সমাজের অপরাধ ও বর্বরতার বিধৃত বিভৎস খতিয়ান।

মানুষের জ্ঞান সীমিত। এ সীমিত জ্ঞান দ্বারা নির্মিত কোন পদ্ধতি বিচিত্র স্বভাব, বৈশিষ্ট, বিভিন্ন জনপদের বিচিত্র ধারার মানুষকে নিয়ন্ত্রণ ও কল্যাণের জন্য উপযোগী কোন ব্যবস্থা হতেই পারে না। এসবের প্রতিনিয়ত ব্যর্থতাই তা প্রমাণ করে। মানুষের কল্যাণ ও নিয়ন্ত্রণের একমাত্র নিখুঁত ব্যবস্থা তার পক্ষেই দেয়া সম্ভব, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি সম্পর্কে রয়েছে যার নিখুঁত ও সম্যক জ্ঞান। যেমন একজন ঘড়ি প্রস্তুতকারক বা মেরামতকারীর পক্ষেই বলা সম্ভব ঘড়ির কোথায় ক্রটি রয়েছে, কিসে তা সেরে উঠবে; অন্যদের পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়। সুতরাং সমাজের এ নৈরাজ্যকর অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ যে মহান স্রষ্টা কর্তৃক নির্দেশিত পথ ও তার আইন বিধানের স্থাপনা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কেউ কেউ মন্তব্য করে থাকেন যে, ইসলামী আইন বিশেষ করে হস্ত কর্তনের আইন সমাজে চালু হলে অপরাধীদের পরিবার বা নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ নিরাপত্তাহীনতায় পতিত হবে। তাদের এ মন্তব্য যে ইসলামী সমাজ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণার অভাব থেকেই উৎপত্তি তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, পূর্বেই বলা হয়েছে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়-দায়িত্ব থাকে সরকারের ওপর। অন্যদিকে ইসলামের ফৌজদারী দণ্ডবিধি কার্যকর করতে গেলে অপরাধী যদি কর্মহীন বা তার ওপর নির্ভরশীল

ব্যক্তিবর্গ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদানের দায়-দায়িত্ব অবশ্যই সরকারের ওপর বর্তায়। সুতরাং অপরাধী বা তার ওপর নির্ভরশীলদের নিরাপত্তাহীনতায় পতিত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তদুপরি এসব অপরাধী চক্র তাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপের মাধ্যমে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ঘৃণ্য কাজকে সফল করতে গিয়ে রাহাজানি ও হানাহানির পথ বেছে নিয়ে যে বহু সংখ্যক ব্যক্তি ও পরিবারকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয় এবং তা যে প্রথমোক্ত সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যার চেয়ে বহু-বহুগুণ বেশী, প্রশ্ন উত্থাপনকারীদের এ দিকটিও বিবেচনায় রাখা উচিত।

এছাড়া ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী চৌর্যবৃত্তির শাস্তি অভাবতাড়িত ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের ওপর যেমনি প্রয়োগ করা যায় না, তেমনি দুর্ভিক্ষে দুর্দশাগ্রস্ত না হলেও ওসব জিনিসের ক্ষেত্রে যেমন- ফল, তরকারী, গোশত, রান্না করা খাদ্য, যে ফসল এখনো খোলানো হয়নি, খেলাধূলা বা গান-বাজনার সরঞ্জাম, বায়তুল মালের সম্পদ প্রভৃতি জিনিস চুরি করলে এবং অন্যান্য জিনিসের ক্ষেত্রে চুরি করা বস্তু দীনারের (স্বর্ণমুদ্রা) এক চতুর্থাংশ মূল্য পরিমাণের কম বা এক ঢালের মূল্যের চেয়ে কম পরিমাণের হলে এ শাস্তি প্রয়োগ করা যায় না। এক্ষেত্রে অন্য কোন শাস্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। হযরত নবী করিম (সাঃ) বলেছেন, "ফল, তরিতরকারী তথা খাদ্যদ্রব্য চুরি করলে হাত কাটা যাবে না।" হযরত আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে, "সামান্য সামান্য জিনিস চুরি করলে নবী করিম (সাঃ) এর যুগে হাত কাটা যেত না।" আর ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী প্রথমবারের চুরির জন্য অধিক কর্মক্ষম ডান হাত নয়, বরং বাম হাতের কব্জি পর্যন্ত কাটার বিধান রয়েছে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, ইসলামী সমাজের বিপুল জনগোষ্ঠীর শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে সমাজ থেকে চৌর্যবৃত্তিকে নির্মূলের লক্ষ্যে কতগুলো সুবিবেচিত শর্তের অধীনে হস্ত কর্তনের বিধান দান করেছেন। যারা এ কল্যাণকর বিধানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছেন, তারা ইসলাম ও ইসলামী বিধান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও ধারণার অভাবেই তা করছেন, নতুবা ইসলাম বিদ্বেষী মানসিকতাই এর পেছনে কাজ করছে। এদের সম্পর্কে ইসলাম প্রিয় প্রতিটি মানুষের সচেতন দৃষ্টি রাখা আজ ঈমান ও সময়ের দাবী।

উত্তরাধিকারী আইন

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন নিয়েও এক শ্রেণীর লোক অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছেন। এ আইন অনুযায়ী, পিতৃ সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে এক ভাইয়ের সমান দু'বোন; অর্থাৎ ভাই বোনের দ্বিগুন সম্পদ লাভ করে থাকে। এটাই আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান। কিন্তু ইসলামের এ বণ্টন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তি আন্দোলনের নেতা-নেত্রীসহ ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো এর গভীরতা ও যৌক্তিকতাকে উপলব্ধি না করে একে নারী-পুরুষ ভেদে ইসলামের বৈষম্য আচরণের (!) প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন এবং শুধু এখানেই থেমে থাকেননি, নারী সমাজ তথা সাধারণ মানুষকে এ আইনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার অপপ্রয়াস এবং সরকারকেও তা রহিত করে নারীদেরকে সমান অংশীদার করার ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবী জানাচ্ছেন। তাদের যুক্তি হলো, "যেহেতু একই পিতামাতার সন্তান, সেহেতু নারী-পুরুষ ভেদে এ বৈষম্য অন্যায় ও অযৌক্তিক এবং নারীর সমান অধিকার ও স্বাধীনতার পরিপন্থি।"

এ দাবীকে সাদামাটা দৃষ্টিতে অনেকের কাছে যৌক্তিক বলে মনে হতে পারে এবং এক্ষেত্রে তারা কিছুটা সফলও হয়েছেন। এক শ্রেণীর হালকা দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদেরকে বিভ্রান্তও করতে সক্ষম হচ্ছেন। কিন্তু জ্ঞানপাপী এসব লোকেরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বা অজ্ঞতার কারণে আল্লাহ্ প্রদত্ত বণ্টন নীতির অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতা ও সাম্যতাকে উপলব্ধি না করেই এ বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। তারা ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী বোনের চেয়ে দিগুন প্রাপ্তির বিনিময়ে ভাইয়ের ওপর যেসব দায়িত্ব-কর্তব্য ও খরচের খাত অর্পিত হচ্ছে এবং বোনকে সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্বমুক্ত রেখে আরো যেসব প্রাপ্তি তার ক্ষেত্রে সংযোজিত হচ্ছে সেগুলোকে বিবেচনায় আনার প্রয়োজন বোধ করেননি। এ ব্যাপারে তারা যে বিভ্রান্তি তাড়িত, তাও অনুসন্ধান করার প্রয়াস তারা পান না।

সমাজের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মেয়েদেরকে বিয়ের পর স্বামীর ঘরে চলে যেতে হয়। স্বামীর সংসার, সন্তান-সন্তুতি, আত্মীয়-স্বজনকে আপন করে দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। আল্লাহ্পাকও তাদেরকে স্বামীর সংসারের অভ্যন্তরীণ দায়িত্বশীলা হিসেবে মনোনীত করেছেন। এক্ষেত্রে পিতৃভিটার প্রতি তাদের সহানুভূতিশীল ও সৌহার্দ্যপূর্ণ দৃষ্টি থাকতে পারে বা কোন প্রয়োজনে সাহায্যও করতে পারে; কিন্তু কোন ব্যাপারে তারা দায়বদ্ধ বা দায়িত্বশীলা নন।

পক্ষান্তরে একজন ভাই পিতা-মাতার অবর্তমান বা বর্তমান থাকা অবস্থায়ও পিতৃ গৃহের সকল প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল। ছোট ভাই-বোনদের ভরণ-পোষণ, লেখা-পড়া, বিয়ে-শাদীর ব্যাপক খরচ বহন, বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দায়িত্ব গ্রহণ, আত্মীয়-স্বজনের হক পালন, নিজে বিয়ে করে আর একজন নারী, সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব গ্রহণসহ সকল প্রকার আর্থিক ও সামাজিক দায়িত্ব ভাইদেরকেই পালন করতে হয়। বোন এক্ষেত্রে স্বামীর সংসারের দায়িত্বশীলা হলেও আর্থিক ব্যয়ভারের দায়-দায়িত্ব তার নেই। এমনকি নিজের ব্যয়ভারেরও দায়িত্ব তার স্বামীর ওপর। উপরন্তু স্বামীর সংসারে থেকে সারা জীবন নিজের প্রচেষ্টায় যদি সে কিছু আয় করতে সক্ষম হয়, তবে তা-ও তার একান্ত নিজস্ব। এতে কারো হক নেই। এছাড়া বোন পিতৃ সম্পত্তিতে ভাইয়ের অর্ধেকসহ আরো পাচ্ছে স্বামীর সম্পদের আট ভাগের এক অংশ এবং স্বামীর কাছ থেকে মোহরানা (যা অবশ্যই আদায়যোগ্য)।

উপরোক্ত আলোচনা মতে ইসলামী শরীয়াহ বোনকে নিজের ও অপরের ভরণ-পোষণসহ সকল প্রকার আর্থিক দায়-দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে নিজের প্রচেষ্টায় অর্জিত আয়ের হেফাজতসহ বিভিন্ন খাত থেকে যে প্রাপ্যতা দান করেছেন, সে তুলনায় এতগুলো কঠিন দায়িত্ব ছাপিয়ে দিয়ে পিতৃ সম্পদের বণ্টনে ভাইকে বোনের চেয়ে দ্বিগুণ প্রদান করে বোনের উপর জুলুম করেছেন বা ঠকিয়েছেন, এ ধরনের চিন্তা ও উক্তি বিকৃত মস্তিস্কপ্রসূত বৈ কিছু নয়। কিন্ত জ্ঞানপাপী এক শ্রেণীর লোক আল্লাহ্ প্রদত্ত এ ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ জঘণ্য কাজটিই করছেন। তাদের তথাকথিত সাম্যের দাবী অনুযায়ী ভাই ও বোনকে সমান অংশ প্রদান করা হলে আর্থিক দায়িত্বমুক্ত বোনের প্রাপ্যতা দায়িত্ব প্রাপ্ত ভাইয়ের তুলনায় যে হতো অত্যধিক এবং তা যে হতো বে-ইনসাফপূর্ণ এতটুকু বোঝার মত বোধ তাদের থাকলেও সাম্যের ধর্ম ইসলামের অন্ধ

বিরোধিতার খাতিরে তারা তা কোনদিন বুঝতে চাননি। কিন্তু আল্লাহপাক তো তাদের মত অন্ধ ও বে-ইনসাফী নন। তাঁর সিদ্ধান্ত যে কল্যাণময় ও ইনসাফপূর্ণ এতে কোন সন্দেহ নেই। একটি উদাহারণের সহায়তা নিলে ইসলামের বণ্টন নীতিতে বোন ভাইদের তুলনায় যে ঠকেনি বরং আল্লাহ্তায়ালার দৃষ্টি নারী জাতির প্রতি যে অধিক সহানুভূতিশীল তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ধরা যাক, কোন মৃত ব্যক্তি দু'সন্তান– একটি ছেলে একটি মেয়ে রেখে মারা যায় এবং তার পরিত্যক্ত টাকার পরিমাণ পঁচাত্তর হাজার। ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী মেয়ে ২৫,০০০/- ও ছেলে ৫০,০০০/- টাকা লাভ করে। উভয়ের বিয়ের সময় উপস্থিত হয়। ছেলে ৫০,০০০/- টাকা নির্ধারিত মোহরের বিনিময়ে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় পিতা থেকে যা ওয়ারিশ পেয়েছে তা স্ত্রীকে মোহর দেয়ায় তার কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। উপরন্তু বিয়ের পর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ তথা পানাহার-বাসস্থানের দায়-দায়িত্ব তার ওপরই ন্যস্ত।

পক্ষান্তরে মেয়ে ৫০,০০০/- টাকা মোহরের বিনিময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। সে পিতা থেকে ২৫,০০০/- টাকার ওয়ারিশ, স্বামী থেকে মোহর বাবদ ৫০,০০০/- টাকা সর্বমোট ৭৫,০০০/- টাকার অধিকারিনি। কিন্তু এ অর্থের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তার ওপর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অর্পিত হয়নি। কেননা তার ভরণ-পোষণের ভার স্বামীর ওপর। স্ত্রীর বাসস্থান, রক্ষণাবেক্ষণসহ সকল প্রকার খরচ প্রদান করতে সে বাধ্য। সুতরাং এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, পিতা হতে প্রাপ্ত সম্পদ মেয়ের অবশিষ্ট থাকলো ও বৃদ্ধি পেলো। পক্ষান্তরে ছেলের প্রাপ্ত সম্পদ বিলুপ্ত হলো এবং আরো দায়িত্ব মাথায় চাপলো। এক্ষেত্রে কে কে সৌভাগ্যবান তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কারো মনে হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে, ইসলামের এ সাম্যময় আচরণ সত্ত্বেও নারী জাতির এ দূরাবস্থা কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত সহজ। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হওয়া সত্ত্বেও দু'একটি ছিটে-ফোঁটা বিধি-বিধান ছাড়া আর সকল আইন-বিধানই কোরান-হাদীস ও বই-পুস্তকেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ইসলামী অনুশাসন দ্বারা সমাজ পরিচালিত হচ্ছে না। দু'একটি যাও যেখানে রয়েছে, আইনের কঠোর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন না থাকার কারণে অপরাধী ব্যক্তি সহজেই পার পেয়ে যাচ্ছে। যার ফলে আজ শুধু নারী সমাজই নয়, পুরো সমাজের মানুষই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে অধিকার বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছেন। ইসলামী অনুশাসন ও তার কঠোর প্রয়োগ যদি সমাজে

প্রতিফলিত হতো, তাহলে ভাই বোনের সম্পদ, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর মোহরানা নিয়ে টালবাহানা, স্ত্রীর প্রতি অবহেলা, ভরণ-পোষণ থেকে বঞ্চিত রাখা এবং অপমান-নির্যাতন করার মত ধৃষ্ঠতা দেখাতে পারতো না। অন্যায়কারী লোকেরা আইনের আওতায় সংশোধিত হতে বাধ্য হতো। ইসলামী আইন ও তার কঠোর প্রয়োগের অনুপস্থিতিই যে নারী সমাজের বঞ্চনার প্রধান কারণ এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এছাড়া ইসলাম বিদ্বেষী ঐ মহলটি উত্তরাধিকার আইনের আরো দু'একটি বিষয় নিয়েও প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকেন। যেমন-ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী মৃত বাবা ও মায়ের অন্যান্য উত্তরাধিকারীর অবর্তমানে একমাত্র ছেলে তার বাবা-মায়ের সব সম্পত্তির মালিক হন। এক্ষেত্রে একমাত্র মেয়ে হলে অর্ধাংশ এবং একাধিক মেয়ে হলে দুই-তৃতীয়াংশ লাভ করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ যদি কেউ তার মা-বাবাকে রেখে মারা যায় (ভাই-বোন না থাকলে) তবে মৃত সন্তানের সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে মা পায় এক তৃতীয়াংশ এবং বাবা পায় দুই তৃতীয়াংশ। তৃতীয়তঃ স্বামী বা স্ত্রী মারা গেলে মৃত স্ত্রীর সম্পদে স্বামী মৃত স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর প্রাপ্যের তুলনায় সর্বাবস্থায় দ্বিগুন লাভ করে থাকে। ফলে উপরোক্ত বোন, মা, স্ত্রী এবং ভাই, বাবা ও স্বামীর প্রাপ্যের এ পার্থক্যকেও ঐ মহলটি নারী পুরুষ ভেদে ইসলামের বৈষম্য নীতি বলে আখ্যায়িত করে একেও রহিত করার ধৃষ্টতাপূর্ণ দাবি জানাচ্ছেন।

তাদের এ দাবির প্রেক্ষিতে বলতে চাই যে, খোদা সৃষ্ট এবং খোদা প্রদত্ত ক্ষুদ্র জ্ঞানের অধিকারী মানুষ হয়ে অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকারী মহান রাব্বূল আলামীনের ওপর খোদকারী করা মানুষের শোভা পায় না। এসবের পেছনের ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা মহান রাব্বুল আলামীনই ভাল জানেন। কিন্তু তারপরও তারা যখন বিভ্রান্তি সৃষ্টির পথ বেছে নিয়েছে তখন বাস্তব উপলব্ধি থেকে দু'চার কথা না বলে পারা যায় না।

প্রথমেই বলতে চাই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা প্রদত্ত কোন বিধানই ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রচিত হয়নি। এসব বিধানও রচিত হয়েছে সমাজের মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ তথা দায়-দায়িত্ব ও প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করেই। কিসে মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হবে সেটাই এখানে মুখ্যতা লাভ করেছে। এর মধ্যে নারী-পুরুষের বেধ-বৈষম্য আবিস্কারের প্রচেষ্টা মানুষের জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা ও নিচুতারই পরিচয় স্পষ্ট করে তোলে।

একমাত্র কন্যা পৈত্রিক সম্পদের অর্ধাংশ এবং একাধিক হলে দুই-তৃতীয়াংশ লাভ করে থাকে। কারণ, ঐ কন্যাকে যদি পুরো সম্পদই দেয়া হতো তাহলে এক্ষেত্রেও (পূর্বের আলোচনা অনুয়ায়ী) সম্পূর্ণ আর্থিক দায়-দায়িত্বমুক্ত একজন মানুষের কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত এ সম্পদগুলো পুঞ্জিভূত হয়ে পড়তো যা হতো সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ও কল্যাণ নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থি। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহ্‌পাক কন্যাকে/কন্যাদেরকে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অধিক নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নির্দিষ্ট হারে সম্পদ প্রদান করে বাকী সম্পদ পিতৃব্য স্বজনদের মাঝে নির্দিষ্ট হারে বণ্টনের ব্যবস্থা করে একদিকে যেমন প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদকে কেন্দ্রীভূত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন, অন্যদিকে ঐ সম্পদ একাধিক মানুষের কল্যাণে আসার ক্ষেত্রও সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে একমাত্র ভাই পুরো সম্পদেরই মালিক হওয়ার পেছনে যৌক্তিক দিক হলো যে, ভাইয়ের ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখিত দায়-দায়িত্বের কথা বিবেচনা করলে তার ওপর অর্পিত বহুবিধ খরচের খাতের কারণে সম্পদ পুঞ্জিভূত বা অব্যবহৃত থাকার সম্ভাবনা নেই। এ সম্পদ বৃহত্তর মানুষের কল্যাণে ব্যয়িত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

তাদের দ্বিতীয় আপত্তির জবাবে বলতে চাই যে, মৃত সন্তানের সম্পদে মায়ের চেয়ে বাবা বেশী পাওয়ার যৌক্তিক দিক হলো মা সংসারে সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্বমুক্ত একজন মানুষ। তার সার্বিক দায়-দায়িত্ব ও খরচের ভার রয়েছে তার স্বামীর ওপর। সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত রেখেও আল্লাহ্‌পাক বিভিন্ন খাত থেকে মাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা মায়ের সার্বিক আর্থিক নিরাপত্তাকে আরো সুদৃঢ় করেছে। পক্ষান্তরে বাবা মায়ের চেয়ে বেশী পাওয়ার যৌক্তিক দিক হলো বাবা আর্থিক দায়-দায়িত্বমুক্ত মানুষ নন। তার ওপর (মৃত সন্তানের মা) স্ত্রীর দায়িত্বসহ একটি সংসারের পুরো দায়-দায়িত্ব ও খরচের খাত রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে মায়ের চেয়ে পিতার অতিরিক্ত পাওনাটাই যৌক্তিক। এতে বিভ্রান্তির অবকাশ নেই।

তৃতীয় আপত্তির জবাবে বলতে চাই যে, মৃত স্ত্রীর সম্পদে স্বামীর পাওনা স্ত্রীর তুলনায় সর্বাবস্থায় দ্বিগুণ হওয়ার যৌক্তিক দিক হলো স্বামীর ওপর রয়েছে তাদের উভয়ের সন্তান-সন্ততি (যদি থাকে) ও পরিবারের পুরো দায়িত্ব। তাছাড়া স্বামীর বৃদ্ধ বাবা-মা, ছোট ভাই-বোন থাকলে তাদের দায়-দায়িত্বসহ আত্মীয় স্বজনের দায়-দায়িত্ব থেকে স্বামী মুক্ত নয়। উপরন্তু স্বামী পুণরায় বিয়ে করে সাংসারিক হতে চাইলে মোহরানা ও বিয়ের খরচাদিসহ আর একজন নারী ও সন্তানাদির পূর্ণ

দায়িত্ব তাকে মাথায় নিতে হয়। পক্ষান্তরে এক্ষেত্রে স্ত্রীর ওপর একদিকে যেমন কারো আর্থিক দায়-দায়িত্ব বর্তায়না, অন্যদিকে ইসলামের নীতি অনুযায়ী তার পূর্ণ দায়িত্ব সন্তানদের ওপর এবং সন্তানের অবর্তমানে বাপ-ভাইয়ের উপর বর্তায়। এছাড়া তিনি যদি অন্য কোন পুরুষকে দ্বিতীয় বিয়ে করেন সেক্ষেত্রে তার দায়-দায়িত্ব চলে যায় তার স্বামীর ওপর। সুতরাং দায়-দায়িত্বের দিক চিন্তা করলে সৃষ্ট এ বৈষম্যকেও অযৌক্তিক বলে মনে করার কোন কারণ নেই।

বহু বিবাহ

ইসলাম পুরুষদেরকে একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দান করেছে (সর্বোচ্চ ৪টি)। ইসলামের এ অনুমতিটিও যে মানবতার কল্যাণের স্বার্থেই তা আমরা পরবর্তী আলোচনাতেই বুঝতে পারবো। কিন্তু ইসলামের এ বিধানকে নিয়ে ইসলাম বিরোধী শক্তি তথা পাশ্চাত্যের তথাকথিত সভ্যতার ধারক-বাহকদের সমালোচনা ও গাত্রজ্বালার অন্ত নেই। কিন্তু তাদের তথাকথিত এক পত্নীর ছদ্মাবরণে যথেচ্ছভাবে উপ-পত্নী গ্রহণ, যৌন অনাচার ও নৈতিক অধঃপতনের পরিণতিতে জারজ সন্তানে যে দেশ ছেয়ে গেছে, আয়নায় নিজেদের সে মুখ দেখার প্রয়োজন তারা বোধ করেন না। ইসলামের ছিদ্রান্বেষণ ও সমালোচনাই তাদের উদ্দেশ্য।

তবে মুসলিম সমাজের এক শ্রেণীর স্বার্থন্বেষী লোকেরাও এর জন্য কম দায়ী নয়। পূর্বেই বলেছি, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। পূর্ণাঙ্গ বিধান হিসেবে ইসলামের প্রত্যেকটি বিধি-নিষেধ একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ কাঠামোকে কেন্দ্র করে সে সমাজের সুবিধা-অসুবিধা অনুযায়ী রচিত। কিন্তু ইসলামী সমাজ কাঠামোর অবর্তমানে আধুনিক ভোগবাদী, বস্তুবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ কাঠামোতে এক শ্রেণীর মানুষ স্বার্থে আঘাত আসে এমন ইসলামী বিধি-নিষেধগুলো এড়িয়ে গিয়ে স্বার্থের অনুকুলের বিধানগুলোকে হীন ও যথেচ্ছা ব্যবহারের মাধ্যমে এক অনাকাঙ্খিত পরিবেশ সৃষ্টি করে নির্দোষ ইসলামের ওপর কালিমা লেপন করার এক অশুভ পাঁয়তারায় লিপ্ত রয়েছেন। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার স্বার্থে একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতিটিকে নিয়েও আজ এক শ্রেণীর পুরুষ প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে, ভোগের স্বার্থে যথেচ্ছ ব্যবহার করে সমস্যা ও সমালোচনার ক্ষেত্র প্রশস্ত করেছেন।

মূলতঃ কেন আল্লাহ্‌পাক এ ব্যবস্থাটি রেখেছেন সে সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে আমরা ইসলামের মহৎ উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বিধায় এর সকল বিধি-বিধান সর্বযুগ ও সর্বকালের সকল মানুষের জন্য। সুতরাং মানুষের যে কোন ধরণের ক্ষুদ্রতম প্রয়োজন ও সমস্যাকে ইসলামের মত একটি পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন জীবন বিধানের পক্ষে উপেক্ষা করা সমীচীন হতে পারে না। আর তা উপেক্ষা করলে মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে ইসলামের বিধি-বিধান অপূর্ণাঙ্গ থেকে যেত। ইসলামী শরীয়তে পুরুষের একাধিক বিবাহের অনুমতি দানও মূলতঃ কিছুটা ব্যতিক্রমী এবং সমস্যা ও প্রয়োজনীয় অবস্থার একটি বিকল্প পথস্বরূপ। যদি তাই না হতো, তাহলে মুসলিম দেশগুলো ইসলামী রাষ্ট্র না হওয়া সত্ত্বেও এবং একাধিক বিয়ের পূর্বশর্তগুলো অনিয়ন্ত্রিত থেকেও একাধিক স্ত্রী গ্রহণকারীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। বাস্তবতা ও পরিসংখ্যান এটা সাক্ষ্য দিবে যে, মুসলিম দেশসমূহে একাধিক স্ত্রী গ্রহণকারীদের সংখ্যা শতকরা দেড় থেকে দুই ভাগের বেশী হবে না।

একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির পেছনে যেসব সমস্যা ও প্রেক্ষাপট কাজ করেছে, তা হলো– আল্লাহ্‌পাক পৃথিবীতে মানুষের জন্য তার পরিকল্পিত কল্যাণময় সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের মাঝে একটি পরিচিতি ও পুতঃপবিত্র বংশধারা রক্ষা এবং মানব সমাজের স্থিতি ও শান্তি রক্ষার স্বার্থে সমাজ থেকে অনাচার-ব্যাভিচার রোধকল্পে যেনা বা ব্যাভিচারের শাস্তি নির্দিষ্ট করেছেন এক'শ দোররা (অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে) এবং 'চঙ্গেচার' বা পাথর মেরে হত্যা (বিবাহিতদের ক্ষেত্রে)। যেহেতু ইসলাম একটি ন্যায়নিষ্ঠ ধর্ম, সুতরাং এ ধর্মে মানুষের একান্ত নিরুপায় অবস্থায় বিকল্প ব্যবস্থা না রেখে যদি এ কঠোর শাস্তি বলবৎ রাখা হতো, তাহলে যেমন ইসলামকে ন্যায়নিষ্ঠ ধর্ম বলে দাবি করা যুক্তিযুক্ত হতো না, অন্যদিকে মানুষের কাছে ইসলামের এ বিধানগুলোর গ্রহণযোগ্যতাও থাকতো না। যেমন– পুরুষরা যেহেতু যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশ গ্রহণ করে থাকে, ফলে যুদ্ধজনিত কারণে বা অন্য কোন কারণে মানব ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশী হয়ে যেতে দেখা গেছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগ বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও জার্মানীতে এমনটি ঘটেছিল (বর্তমানে ইরান ও ইরাকে যুদ্ধের পর এ অবস্থা বিরাজ করছে)। এ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অসংখ্য বিয়েযোগ্যা মেয়েদের বিয়ে সমস্যার সমাধান একদিকে যেমন আবশ্যক, অন্যদিকে এর সুষ্ঠু সমাধান না দিয়ে অনাচার রোধের নামে অনাকাঙ্খিত পদস্খলনের জন্য ইসলাম যদি এ কঠোর শাস্তি বলবৎ করে, তবে তা ন্যায়ের মানদণ্ডে যুক্তিযুক্ত বা মানুষের কাছেও তা গ্রহণযোগ্যতা পেত না। সুতরাং এসকল সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্ম, সমাজ বা মানব রচিত মতাদর্শ নিরব

ভূমিকা পালন করতে পারলেও ইসলামের ন্যায় একটি সার্বজনীন ও সব সমস্যার সমাধানযোগ্য ধর্মগ্রন্থ তা পারে না। তাই এ জটিল সমস্যার পুতঃপবিত্র এবং একমাত্র সমাধান যে পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ, তাতে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর নারী সমাজও এ রায়ই দিয়েছেন। যুদ্ধে জার্মানীর অসংখ্য পুরুষ নিহত হয়। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল যে, হাজার হাজার মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত বর খুঁজে পাচ্ছে না। তখন তারা পুরুষদের কাছে একাধিক বিয়ের দাবি জানায়। ১৯৪৮ সালে জার্মানীর মিউনিখে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী নারীর আধিক্য ও পুরুষের স্বল্পতাজনিত সমস্যা সমাধানকল্পে একাধিক বিয়ের সুপারিশ করে (মূলঃ মুহাদিরাত ফিস সাফাফা আল ইসলামিয়া/আহমাদ মুহাম্মদ জামান এবং মাসিক পৃথিবী জুন, ৮৬ সংখ্যা)। এছাড়া তৎকালীন একজন বিশিষ্ট জার্মান মহিলা বলেন, "একাধিক বিয়ে আইনসম্মত করার মধ্যেই জার্মান মহিলাদের সমস্যার সমাধান নিহিত। (মূলঃ তাআদ্দুদুয যাওয়াত ওয়া হিকমাতুহু ফিল ইসলাম/ডঃ জুমআ আল খাওলী এবং মাসিক পৃথিবী জুন, ৮৬ সংখ্যা)।

দ্বিতীয়ত ঃ কোন কোন পুরুষকে প্রকৃতিগতভাবে অধিক কামশক্তি সম্পন্ন হতে দেখা যায়। নানা কারণে যখন এক স্ত্রী তাদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়, তখন ঐ সমস্ত পুরুষদের বিবাহের প্রাচীর লংঘন করে বাইরে যৌন অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি করার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়– যা ইসলামী পরিচ্ছন্ন নীতির পরিপন্থী। আর ইসলাম তা রোধকল্পে বৈধ এবং বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কঠিন শর্ত সাপেক্ষে দায়িত্ব মাথায় দিয়ে পুরুষদের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। আর পাশ্চাত্য সমাজ একাধিক উপ-পত্নী গ্রহণ, অবাধ যৌনাচার এবং অবৈধ সন্তানদের স্বীকৃতি দিয়ে এর সমাধান দিয়েছে।

তৃতীয়ত ঃ কারো প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা বা সন্তান জন্মদানে অক্ষম হলে প্রকৃতিগতভাবেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সন্তান লাভের বাসনা দেখা দেবে অথবা স্ত্রী যদি দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং প্রয়োজনীয় দায়-দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে এসব সমস্যার সমাধান এবং পুতঃপবিত্রতা রক্ষার স্বার্থেই ইসলাম পুরুষদেরকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দান করেছে। আর এসব ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীদেরকেই স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য উৎসাহিত করতে দেখা যায়।

সুতরাং এ আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইসলাম চায় একটি পরিচ্ছন্ন, পবিত্র, সম্মান ও মর্যাদাবোধে পরিপূর্ণ খোদাভীরু সমাজ এবং এ পরিচ্ছন্ন

সমাজ রক্ষা ও একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে ইসলাম পুরুষদেরকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। যৌন সম্ভোগ বা লালসা চরিতার্থের দিক চিন্তা করে দেয়নি। আজকের সমাজের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলেও এর কিছুটা বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো। মুসলিম দেশগুলো ইসলামী আইন দ্বারা পরিচালিত না হওয়া সত্ত্বেও একাধিক স্ত্রী গ্রহণকারীদের সংখ্যা একদিকে যেমন খুবই নগণ্য, অন্যদিকে কিছু কিছু হঠকারী ও প্রতারণামূলক ঘটনা ব্যতীত কোন সামর্থবান বা কুমারী মেয়ে স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে কোন পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রী হতে চায় না। সাধারণতঃ গরীব, অসহায় ও যোগ্য কুমার স্বামী পেতে অসামর্থ বা তালাকপ্রাপ্তা/বিধবা মহিলারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে থাকে।

সুতরাং এ অনুমতিটি যে সমাজ ও মানুষের কল্যাণের স্বার্থেই দেয়া হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

নারীদের একাধিক স্বামী গ্রহণ নয় কেন?

ইসলামে পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ সংক্রান্ত আইনটিকে নিয়ে সমালোচনাকারীরা যে সকল কারণে পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে সক্ষম সে সকল কারণগুলো বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও (পুরুষ বন্ধ্যা, চিররোগা ইত্যাদি) নারীরা কেন একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না –এ প্রশ্ন তুলে থাকেন এবং একে নারী-পুরুষ ভেদে ইসলামের বৈষম্য নীতি বলে মনে করেন। কিন্তু আসলে কি তাই? আসলে ইসলামের সুমহান বিধি-বিধানগুলো সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি ও আস্থার অভাবেই সমালোচনাকারীদের মনে এ ধরণের প্রশ্নের উদ্বেগ ঘটে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌পাক কেন নারীদের জন্য এ ব্যবস্থাটি রাখেননি, সে সম্পর্কিত আলোচনায় তাদের এ ভুল ভাঙবে বলে বিশ্বাস।

প্রথমতঃ নারীদের একাধিক স্বামী গ্রহণের পেছনে যে সমস্যাটি সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হলো– একজন নারীকে যদি একাধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হতো, তাহলে তার গর্ভে যেসব সন্তান জন্ম নিত, সেসব সন্তানগুলোর পিতৃ পরিচয় কিভাবে নির্ধারিত হতো?

দ্বিতীয়তঃ ইসলাম একটি পুতঃ পবিত্র ধর্ম এবং ইসলাম সব সময় সুন্দরকেই ভালবাসে। নারীদেরকে একাধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি দিয়ে একাধিক স্বামীর মিলনের ফলে সৃষ্ট শংকর জাতীয় সন্তান দ্বারা পৃথিবী আবাদ হোক– এ ধরণের একটা ব্যবস্থাকে কি ইসলামের মত পবিত্র ধর্ম অনুমোদন দিতে পারে?

তৃতীয়তঃ জন্ম নেয়ার পর থেকে অসহায় সন্তানরা পিতা-মাতার গভীর ভালবাসা, মায়া-মমতা, বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অর্থ সম্পদ ব্যয়ের বিনিময়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। আবার এ সন্তানরাই বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতার একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় এবং গভীর ভালবাসায় তাদের দায়িত্ব পালন করে। প্রশ্ন হলো, একাধিক স্বামীর মিলনের ফলে সৃষ্ট সন্তানের প্রতি পিতামাতার তদ্রুপ ভালবাসা ও দায়িত্ব কি প্রকাশ পেত? এবং পিতৃ পরিচয় নির্ধারিত না হওয়ার কারণে বৃদ্ধ বয়স বা অসহায় অবস্থায় সন্তানদের কি পিতামাতার প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের মত শ্রদ্ধা-ভালবাসা অবশিষ্ট থাকতো?– যা একটি সুখী সমাজ গঠনের জন্য অত্যাবশ্যক!

চতুর্থত ঃ আল্লাহপাক একাধিক বিবাহের সুযোগের মাধ্যমে নারী ভোগের সুবিধা দিয়ে পুরুষের সাথে খাতির করেছেন আর নারীদের সাথে করেছেন অন্যায়– ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয়। সমাজের কল্যাণ এবং মানুষের সমস্যার সমাধানের দিক চিন্তা করেই কঠিন শর্ত সাপেক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ নির্দেশ দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো, নারীদেরকে যদি তাদের সমস্যাগুলোর দিক চিন্তা করে একাধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হতো, তাহলে পুরুষদেরকে প্রদত্ত শর্ত এবং দায়-দায়িত্বগুলো নারীদের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিকভাবে বর্তাতো। কেননা, এক্ষেত্রে তখন তা নারীপ্রধান পরিবারে রূপান্তরিত হতো। সুতরাং সকল স্বামীর সাথে সমান আচরণ, সকলকে সমান ভরণ-পোষণ প্রদান, যৌন জীবনে সকলকে পরিতৃপ্তকরণ, সন্তানদের সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহণ ইত্যাদি দায়িত্বগুলো এসে যেত নারীর উপর– যা নারীদের স্বভাব, প্রকৃতি, কর্মক্ষমতা, দৈহিক সামর্থ ইত্যাদির পরিপন্থি।

এছাড়া আর যে যে সমস্যাগুলো এক্ষেত্রে দেখা দিত, তাহলো ঃ

(ক) নারী তার একাধিক স্বামী-সন্তান নিয়ে কোথায় অবস্থান করবে? বাপের বাড়ী, কোন এক স্বামীর বাড়ী, না নিজে আলাদা বাড়ী করে?

(খ) এক্ষেত্রে ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের কি হবে? সন্তানরা কার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে?

(গ) নারীরা যেহেতু প্রকৃতিগতভাবেই পুরুষের তুলনায় অধিক সময় দুর্বল থাকে, যেমন– ঋতুকালীন, গর্ভধারণকালীন, সন্তান প্রসব ও তার পরবর্তীকালীন সময়। এ ব্যাপক সময়ের শারিরীক দূর্বলতার কারণে তার একাধিক স্বামী যদি সমাজে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে? (যা রোধের জন্য ইসলামের কঠোর ব্যবস্থা)

বা তাদের অধিকার অনুযায়ী বহু স্ত্রী গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়– সেক্ষেত্রে পরিবার, সন্তান, সমাজের অবস্থা কি দাঁড়াবে?

সুতরাং কি করে ইসলাম এসব জটিল সমস্যার আবর্তে পতিত একটি অধিকার নারীদেরকে দিতে পারে?

আর ইসলাম নারীদের সমস্যা সমাধানের পথটি তো বন্ধ করে দেননি। একজন পুরুষ যদি যৌন জীবনে শারিরীকভাবে অক্ষম, সন্তান উৎপাদনে অক্ষম বা চিররোগা হন, তাহলে একজন নারীর পূর্ণ অধিকার রয়েছে তাকে পরিত্যাগ করে একজন সক্ষম স্বামী গ্রহণ করার। সুতরাং এ ব্যবস্থাটি থাকা অবস্থায় ইসলাম কি করে একটি জটিল ও সমস্যাসংকুল পদ্ধতি সমাজের ওপর চাপিয়ে দিতে পারে?

পুরুষদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ, নারীদেরকে অনুমতি দিতে গেলে যে জটিল সমস্যার মুখোমুখী হতে হচ্ছে, পুরুষদের ক্ষেত্রে তাতো হচ্ছেই না; বরং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় তা একাধিক জটিল সমস্যার বিকল্প সমাধানযোগ্য ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

কিন্তু আজ ইসলামী আইন ও সমাজ ব্যবস্থার অনুপস্থিতির সুযোগে ভোগবাদী ও বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থায় এক শ্রেণীর দায়িত্বজ্ঞানহীন পুরুষকে প্রয়োজনে– অপ্রয়োজনে ধর্মীয় অধিকারের নামে এ বিধি ব্যবস্থাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে দেখা যায়– যা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সম্ভবপর হতো না। সেখানে প্রয়োজন যাচাই এবং শর্তগুলো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো। তাছাড়া একজন ঈমানদার, খোদাভীরু মুসলমান এ ধরণের একটি সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে হাজার বার তার প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ভেবে একান্ত প্রয়োজনেই শুধু এ ধরনের একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো। তখন এ ব্যবস্থাটি নারীদের কাছে দৃষ্টিকটু না হয়ে সমস্যার সমাধানসূচক ব্যবস্থা হিসেবেই পরিস্ফুটিত হয়ে উঠতো।

হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর বহু বিবাহ

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বহু বিবাহকে নিয়েও ইসলাম বিদ্বেষী মহল তথা সালমান রুশদীর দোসর ও অনুচরেরা অপপ্রচার ও ঠাট্টা-বিদ্রুপে লিপ্ত রয়েছেন, এমনকি তারা এ ব্যাপারটিকে নিয়ে কুৎসিত মন্তব্য করতেও ইতস্ত করছেন না। তাদের এ উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা ও মন্তব্যের ফলে হুজুর (সাঃ)-এর বহু বিবাহের মৌল উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাবহীন ব্যক্তি বিশেষ তথা সাধারণ মানুষের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের দোলায় আবর্তিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। অথচ তাদের এ প্রচারণা যে কত ভ্রান্ত ও অসাড়, তা আমরা এ সম্পর্কিত আলোচনা থেকে বুঝতে সক্ষম হবো।

একথা সকলেই অবগত যে, আমাদের প্রিয় নবী তার জীবদ্দশায় ১৪টি (মতান্তরে ১৩টি) বিবাহ করেছিলেন এবং প্রথম বিয়ে করেছেন তাঁর ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়সী বৃদ্ধা বিবি খাদিজাকে (যাঁর ইতিপূর্বে আরো ২টি বিয়ে হয়েছিল), এবং বিবি খাদিজার জীবদ্দশায় ও নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তিনি আর কোন বিয়ে করেননি। তিনি তাঁর ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত দীর্ঘ ২৫ বছর বিবি খাদিজার সাথে সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করেছেন। এছাড়া তিনি বাকী সবগুলো বিয়েই করেছিলেন ৫৩ বছর বয়স থেকে জীবনের শেষ দশ বছরে।

কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষী এসব সমালোচনাকারীরা যে ধারণা ও চিন্তার বশবর্তী হয়ে কুৎসিত মন্তব্য ও কটাক্ষ করছেন, তাদের ধারণাই যদি সঠিক হতো, তাহলে ২৫ বছর বয়সের একজন ভরা যৌবনের যুবক ৪০ বছর বয়স্কা একজন বৃদ্ধা মহিলাকে নিয়ে দীর্ঘ ২৫ বছর পর্যন্ত সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করলেন কিভাবে? সুঠামদেহী এ যুবকের জন্য ৪০ বছরের এ বৃদ্ধা কি যথেষ্ট হতো? ভরা যৌবনের এ ২৫টি বছরে কি আরো বহু সংখ্যক বিয়ে করা প্রয়োজন হয়ে পড়তো না? যেহেতু তিনি বৃদ্ধকালীন শেষ ১০ বছরেই ১৩টি বিয়ে করেছিলেন!

আসলে আমরা ভোগবাদী ও বস্তুবাদী দুনিয়ার বাসিন্দা বলে ভোগই আমাদের কাছে একমাত্র সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সব কিছুকেই আমরা ভোগের দৃষ্টিতে দেখি। ভোগের তাড়নায় কোন কিছুকে গভীরভাবে অনুধাবন করার সময় আমাদের হয় না। এমনকি আল্লাহ্ প্রেরিত মহামানবদের ক্ষেত্রেও না। কিন্তু তাদের ভোগবাদী ধারাণাই যদি সত্য হতো, তাহলে আবু জেহেল-আবু লাহাবদের সবচেয়ে সুন্দরী নারী, অর্থ সম্পদ, রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রস্তাব কি উপেক্ষার বস্তু ছিল? আজকে ভোগবাদী দুনিয়ায় নারী-পুরুষরা তো ভোগের স্বার্থে অনেক কেলেংকারীই ঘটাচ্ছে। কিন্তু কেউ কি দেখেছে পুতঃ পবিত্র জীবনে কোথাও কোন কলংক? শুনেছে কি কেউ তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কোথাও চরিত্র সম্পর্কে বা অন্য কোন বিষয়ে কোন অভিযোগ? ভোগবাদী দুনিয়ার আমরা যুবক-যুবতীরা তো বিবাহ পূর্ব বহু সুনাম-দুর্নাম সঞ্চয় করে বিয়ের পিড়িতে পা দেই। কোন শত্রুর মুখেও কি শুনেছে কেউ আরবের সবচেয়ে সুঠাম-সুন্দর যুবকের নামে 'আল-আমিন' উপাধির বাইরে আর বিন্দুমাত্র কিছু? আসলে ভোগই আমাদের সকল সর্বনাশের মূল। ভোগাবাদী চিন্তা মূখ্য হয়ে পড়ার কারণে আমরা মহামানবদের সম্পকেও ধৃষ্ঠতাপূর্ণ ধারণা ও উক্তি করতে ইতস্তত করি না।

অথচ আমাদের প্রিয় নবীকে মানুষ তথা ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার স্বার্থেই আল্লাহ্র নির্দেশে জীবনের শেষ পর্বে একাধিক বিয়ে করতে হয়েছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বিধায় ইসলামের বিধি-বিধানগুলো শুধু মানব জাতির অর্ধেক পুরুষের জন্যই নাযিল হয়নি। এ বিধান অপর অর্ধেক নারীর জন্যও। কিন্তু পুরুষরা নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে অবাধে সার্বক্ষণিক মেলামেশার সুযোগ পেতেন বিধায় তাদের পক্ষে ইসলামের নিয়ম-কানুন বিধি-বিধানগুলো হাতে কলমে শিক্ষা লাভের সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু নারীদের পক্ষে ইসলামের পর্দা প্রথার কারণে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহচর্যে আসা সম্ভব ছিল না। এ কারণে তারা ইসলামের বহু বাস্তব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত থেকে যেত। বিশেষ করে অন্যান্য শিক্ষার পাপাপাশি মানব জাতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে ইসলাম যেসব বিধি-বিধান ও নীতিমালা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যা তাদের জানা একান্ত আবশ্যক। অনেক সময় নারীরা জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে অনেক কিছু জেনে নেয়ার চেষ্টা করতেন; কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল নিতান্তই অপ্রতুল।

তাই এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে নবী করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ্র নির্দেশে বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন মেজাজ ও স্বভাবের, বিভিন্ন গুনাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নারীদের বিয়ে করতে হয়েছে নারী সমাজের মধ্যে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের

স্বার্থেই। তাঁদের ওপর যে একটি গুরু দায়িত্ব অর্পিত ছিল– কোরআনের ভাষায় তা হলো, 'হে নবীর স্ত্রীগণ, নবীর ঘণিষ্ঠ সাহচর্যে থেকে তোমরা যা শোন এবং দেখ তা অন্যদের কাছেও তুলে ধর।' (সুরা আহযাব-৩৪) এবং 'হে নবীর স্ত্রীগণ, তোমরা কিন্তু সাধারণ স্ত্রী লোকদের মত নও। (সূরা আহযাব-৩২)

উপরোক্ত আয়াত হতে একথা স্পষ্টরূপে প্রমাণ হয় যে, নবীর স্ত্রী হিসেবে তাঁর ঘনিষ্ট সাহচর্য থেকে এরা যা জানার ও দেখার সুযোগ পাচ্ছে, তা অন্য কোন নারীর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না; ইসলামের আদর্শিক গণ্ডির মধ্য থেকে তা সম্ভব নয়। সুতরাং এদের দায়িত্ব হচ্ছে তারা যা জানার ও শেখার সুযোগ পাচ্ছে, তা মুসলিম সমাজের অন্যান্য নারীদের শিক্ষা দেয়া, যাতে ইসলামী সমাজের উপযোগী বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়ে মুসলিম নারী সমাজও গড়ে উঠতে পারে। আর এভাবে গোটা সমাজই যেন ইসলামী সমাজে রূপান্তরিত হয়।

এ বিশাল দায়িত্ব শুধুমাত্র একজন স্ত্রী দ্বারা সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব ছিল না। এ কারণে তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বিভিন্ন নারীদের বিয়ে করে একান্ত সাহচর্যে নিজ হাতে গঠন করে এদের মাধ্যমে সমাজের সব শ্রেণীর মহিলাদের ইসলামী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং এসব নারীরা এ দায়িত্ব পালন করেছেনও সুচারুরূপে। এটাই ছিল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বহু বিবাহের মূল তাৎপর্য।

এছাড়া আরো কিছু সঙ্গত কারণও নবীজির বহু বিবাহের পেছনে নিহিত ছিল। যেমন জাহেলী যুগে আরব সমাজে অনেক কু-প্রথার মধ্যে পালক পুত্র গ্রহণ ছিল একটি। সে সমাজে কেউ কাউকে নিজ পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলে সে তার ঔরষজাত পুত্রের মত স্বীকৃত হতো। অথচ তা কিছুতেই ন্যায়সঙ্গত ছিল না। মহান আল্লাহ্‌পাক শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর মাধ্যমে সমাজ থেকে এ কু-প্রথা নির্মূল করতে চাইলেন এবং মহানবী (সাঃ)-কে তাঁর পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারিসার তালাক গ্রহীতা স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করার নির্দেশ দিলেন। এ বিয়ের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে, পালকপুত্র হিসেবে কাউকে গ্রহণ করলেই ঔরষজাত বা প্রকৃত পুত্র হয়ে যায় না। সমূহ অকল্যাণকর এ প্রথাকে ইসলামী সমাজে এভাবে স্বীকৃতি দেয়া হলো না।

রাজনৈতিক কারণ ঃ রাজনৈতিক কারণেও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে কয়েকটি বিয়ে করতে হয়েছিল। আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধানকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তিনি যে আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন, এর বিরুদ্ধে মক্কার প্রভাবশালী গোত্র কোরাইশদের একটা বিরাট অংশ প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তাদের বিরোধীতার কারণে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে হয়েছে। কোরাইশদের এ বিরোধীতার তীব্রতা হ্রাস করার লক্ষ্যে তিনি কোরাইশদের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিয়ে করেন। এ বিয়ের কারণে কোরাইশদের মারমূখী ভূমিকা কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বেগমদের মধ্যে হযরত সাফিয়া, জুয়াইরিয়া ও রায়হানা ইয়াহুদ গোত্রের মেয়ে ছিলেন। তাদেরকে বিয়ে করার কারণে ধনবল ও জনবলে বলীয়ান আরবের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের শত্রুতাও অনেকটা হ্রাস পায়। ঠিক একই কারণে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সাথেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে সব ক্ষেত্রেই ইসলামের ভিত মজবুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এছাড়াও আরো অনেক কারণ এর পেছনে নিহিত ছিল, সেগুলো আর উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

সুতরাং দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, মানুষের সামগ্রীক কল্যাণের জন্য যে মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নবী করিম (সাঃ)-কে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মানসেই তিনি একাধিক বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যারা তাঁর এ মহান উদ্দেশ্যকে নিয়ে বিকৃত মন্তব্য ও কটাক্ষ করছেন তাদের উদ্দেশ্য যে মহৎ নয় এবং ইসলামের বিরোধিতাই একমাত্র উদ্দেশ্য, তা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

তালাক প্রথা

মহান আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে 'তালাক' প্রথাকে বৈধ কাজের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এতটা ঘৃণ্য ও হীন কাজ বলে আখ্যায়িত করা সত্ত্বেও এ ব্যবস্থাটিকে বৈধতা দান করেছেন, সে সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ না করেই ইসলাম বিদ্বেষী মহল ইসলামের এ প্রথাটিকে নিয়েও যারপর নাই সমালোচনায় লিপ্ত রয়েছেন। তাদের বক্তব্য হলো, এ ব্যবস্থা অমানবিক এবং নারীদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার পরিপন্থী।'

কিন্তু আসলে কি তাই?

আমরা জানি, ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। এ ধর্মে কোন অকল্যাণকর ও অমানবিক ব্যবস্থা থাকতে পারে না এবং নেই-ও। এর প্রতিটি বিধি-বিধান মানুষের কল্যাণের স্বার্থেই রচিত। ইসলামের তালাক প্রথাটিও অশান্তময় দাম্পত্য জীবনে পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি রক্ষার স্বার্থে সুশৃঙ্খল প্রয়োগ পদ্ধতির আওতায় একান্ত নিরুপায়ের ক্ষেত্রে একটি ঘৃণ্য অথচ প্রচলিত ব্যবস্থা।

সুখী দাম্পত্য জীবন সকলের একান্ত কাম্য ও আরাধনার বস্তু হওয়া সত্ত্বেও এ জিনিসটি সকলের জীবনে সমান সুখের হয়ে ধরা দেয় না। নানা সঙ্গত ও অসঙ্গত কারণে অনেক পরিবারেই দাম্পত্য বা পারিবারিক সমস্যা নরক যন্ত্রণায় রূপান্তরিত হতে দেখা যায়। ইসলাম এসব সমস্যাকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিরোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন পথ ও পন্থা বাতলে দিয়েছেন। কিন্তু শান্তিপূর্ণ সকল ব্যবস্থাও যদি সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়, স্বামী-স্ত্রীর মনে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ তীব্র হয়ে পারিবারিক জীবন অচল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে বা এ সংকটময় দাম্পত্যকে টিকিয়ে রাখাটাই আরো একাধিক জটিল সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, এমনিতর নিরুপায় অবস্থার ক্ষেত্রেই শুধু একটি সুশৃঙ্খল প্রয়োগ পদ্ধতির আওতায় তালাক বা বিচ্ছেদের নির্দেশ রয়েছে। কারণ, যুগ যুগ ধরে নরক বাসের চেয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন জীবন গড়াটাই যে মন্দের একমাত্র পথ, তাতে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। যেমন– বিয়ের পর কোন দম্পতির ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে, স্বামী বা স্ত্রী একজন যৌন জীবনে অক্ষম বা দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত। এক্ষেত্রে সুস্থ

ব্যক্তিটিকে হয় সারাজীবন ধুঁকে ধুঁকে বৈধব্য নামক নরক যন্ত্রণাকে বেছে নিতে হবে (যাতে নৈতিক পদস্খলনের সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়) নতুবা বিচ্ছেদের পথ বেছে নিয়ে অথবা স্বামীর ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য থেকেও দ্বিতীয় বিবাহের মাধ্যমে নতুন জীবন শুরু করতে হবে। এ দু'টো পন্থার মধ্যে দ্বিতীয় পন্থাটিই যে উভয়ের জন্য অধিক কল্যাণকর, তা সুস্থ ব্যক্তিমাত্রই রায় দেবেন।

এমনিতর জটিল সমস্যা বা অন্যান্য কারণে সৃষ্ট অশান্তময় দাম্পত্য জীবন থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যেই মহান আল্লাহ্পাক এ ঘৃণ্য ব্যবস্থাটিকে বৈধতা দান করেছেন। এ ব্যবস্থাটি যদি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামে না রাখা হতো, তাহলে চরম দাম্পত্য অশান্তি থেকে পরিত্রাণের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান অপূর্ণাঙ্গ থেকে যেতো।

আর তালাক শুধু পুরুষদেরই একচেটিয়া অধিকার নয়। নারীরাও যদি মনে করে যে, স্বামীর সাথে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে ঘর করা সম্ভব নয়, তাহলে স্বামী যে মোহরানা বা উপহার-উপঢৌকন তাকে দিয়েছেন, সেসব কিংবা যতটায় উভয় পক্ষ রাজী হয়, তা ফিরিয়ে দিয়ে নিজেকে স্ত্রীত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে– এ অধিকার তার রয়েছে। আল্লাহপাক কোরআনে বলেছেন, "তোমরা যদি একথা চিন্তা করে ভয় পাও, স্বামী-স্ত্রী দু'জনে আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তাহলে স্ত্রী যা-ই বিনিময় মূল্য দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তাতে তাদের দু'জনের কোন গুণাহ হবে না। (বাকারা-২২৯) হাদীসে রয়েছে, 'হযরত সাবিত ইবনে কায়েসের স্ত্রী রাসূলে করিম (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে রাসূল! আমি আমার স্বামী সাবিত ইবনে কায়েসের চরিত্র ও দ্বীনদারীর দিক দিয়ে কোন দোষারোপ বা অভিযোগ করছি না; কিন্তু আসলে আমি তাকে পছন্দ করি না। নবী করিম (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, সে তোমাকে কি দিয়েছিল? তিনি বললেন, একটি বাগান। সে তালাকের বিনিময়ে সে বাগানটি ফিরিয়ে দিতে রাজী কিনা জিজ্ঞেস করলে সে বললো, জি হ্যাঁ! তখন নবী করিম (সাঃ) সাবিতকে বললেন, তুমি বাগানটি ফিরিয়ে নাও এবং ওকে তালাক দিয়ে দাও।

এ পর্যায়ে জেনে রাখা আবশ্যক যে, স্বামীর. পক্ষ থেকে বাস্তবিকই কোন কারণ না থাকলে স্ত্রীর তালাক গ্রহণের জন্য তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। নবী করিম (সাঃ) বলেছেন, 'যে নারী কোন কারণ ব্যতিরেকেই স্বামীর কাছে তালাক চাবে, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম হয়ে যাবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তালাক প্রথাটি শুধু

একান্ত নিরুপায়ের ক্ষেত্রেই একটি সুশৃঙ্খল প্রয়োগ পদ্ধতির আওতায় প্রযোজ্য। কিন্তু সমাজে এক শ্রেণীর লোক প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে এ বিধানটিকে একদিকে যেমন যথেচ্ছ ব্যবহার করছেন, অন্যদিকে অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে ভ্রান্ত ও বিকৃত প্রক্রিয়ায় এর প্রয়োগ করে সমালোচনকারীদের সমালোচনার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করছেন। ইসলাম বিদ্বেষী মহল সুমহান ধর্ম ইসলামের কোন ত্রুটি খুঁজে না পেয়ে ওসব অজ্ঞ-মূর্খদের অজ্ঞতাপ্রসূত ভ্রান্ত কার্যক্রমকে ইসলামের নিয়ম বিধান বলে অপপ্রচার করছেন এবং ব্যঙ্গাত্মক ও বিকৃত উপস্থাপনার মাধ্যমে নির্দোষ ইসলামের ওপর কালিমা লেপন করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছেন। আশ্চর্য হতে হয় যে, ৯০% ভাগ মুসলমানের এ দেশে টেলিভিশন ও রেডিওর মত শক্তিশালী জাতীয় প্রচার মাধ্যমেও তারা এ বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশ টেলিভিশন হুমায়ুন আহমেদ রচিত নাটক 'অয়োময়' ধারাবাহিকভাবে প্রচার করে। এ নাটকে 'কাদের' চরিত্রটিকে দিয়ে তার স্ত্রীকে রাগের বশে একসাথে তিন তালাক দেখিয়ে (আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর অজ্ঞ লোক যা করে থাকে) অবশেষে তালাক সম্পর্কিত কোরআনের আয়াতটির (বাকরা-২৩০) প্রেক্ষাপট, প্রকৃত ব্যাখ্যা ও অন্তর্নিহিত ভাবধারাকে বিবেচনায় না এনে নাটকের ভণ্ড মৌলভীকে দিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যা, বিকৃত উপস্থাপনার মাধ্যমে টিভির মত একটি জাতীয় প্রচার মাধ্যমে দর্শকদের হাসির খোরাক তৈরী করেছেন এবং এসব বিকৃত অপপ্রচারের কার্যক্রমকে ইসলাম তথা কোরআনের বিধান বলে চালিয়ে দিয়েছেন। অথচ আমরা জানি, বিষময় দাম্পত্য জীবনে একান্ত নিরুপায়ের ক্ষেত্রে ইসলাম এর প্রয়োগকে একটি সুবিবেচিত পদ্ধতির আওতায় বৈধতা দান করেছেন।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিরোধ বা সমস্যা মীমাংসার সকল প্রকার শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর বিচ্ছেদই যদি সমাধানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে আল-কোরআন ঋতুমুক্ত অবস্থায় (দৈহিক মিলনের পূর্বেই) স্ত্রীকে এক তালাক প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। এ তালাক প্রদানের পর স্ত্রীর ইদ্দতকাল অর্থাৎ পরবর্তী তিনটি ঋতুকাল পর্যন্ত যদি স্বামী তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন না করে, তাহলে এ ইদ্দতকাল উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা অলংঘনীয় তালাকে পরিণত হবে। কিন্তু ইদ্দতকালের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে ঐ তালাক প্রত্যাহৃত হবে। দ্বিতীয় পন্থা হলো, এক তালাক প্রদানের পর পরবর্তী ঋতুবতী হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে দ্বিতীয় তুহরে (ঋতুমুক্ত অবস্থায়) দ্বিতীয় তালাক দিয়ে পরবর্তী ঋতুবতী হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দেশ রয়েছে। ইতিমধ্যে স্ত্রীকে স্বামীর ঘরেই অবস্থান

করতে হবে এবং পুণরায় তাদের মধ্যে সমঝোতার পূর্ণ প্রচেষ্টা নিতে হবে। (মিলনের পূর্বেই ঋতুমুক্ত অবস্থায় এক তালাক করে প্রয়োগ এবং স্ত্রীকে তালাক প্রয়োগকালীন পর্বে স্বামীর ঘরেই অবস্থানের নির্দেশের পেছনে কোরআনের বিজ্ঞানভিত্তিক নিগূঢ় রহস্য হলো– এ তালাকটি যদি আবেগ, আক্রোশ বা অসুস্থ মস্তিস্কপ্রসূত হয়ে থাকে, তাহলে ইতিমধ্যেই তাদের পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা ও সমঝোতা পড়ে উঠবে এবং সহজভাবেই ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। কিন্তু এ প্রচেষ্টাও যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে তৃতীয় তুহরে তৃতীয় তালাক দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

এমনি প্রচেষ্টা ও পদ্ধতির মাধ্যমে তালাক সংঘটিত হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পুনরায় সমঝোতার ক্ষীণতম সম্ভাবনাও থাকার কথা নয়। এ অবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার প্রয়োজনে অন্য স্বামী গ্রহণ করলে স্বাভাবিকভাবে দাম্পত্য জীবন চালাতে গিয়ে আবার যদি কখনো কোন কারণে তাদের সম্পর্ক বিষময় হয়ে ওঠে এবং পরিণতিতে উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় তালাক সংঘটিত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে প্রথম স্বামী যদি ইচ্ছা করেন (পূর্বের স্বামী হিসেবে দাবি বা অধিকারের ভিত্তিতে নয়), তাহলে সমাজের অন্যান্য মহিলার ন্যায় এ মহিলাকেও বিয়ে করতে পারেন– এটাই শরীয়তের বিধান এবং উক্ত আয়াতের অর্থ।

কিন্তু নাট্যকার নাটকের ভন্ড মৌলভীকে দিয়ে যে সমাধান বাতলে দিয়েছেন এবং আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর অজ্ঞ, ভণ্ড ও মূর্খের দল যা করে থাকে (অর্থাৎ একই সাথে তিন তালাক এবং পূর্ব চুক্তি মোতাবেক অন্যজনের সাথে বিয়ে দিয়ে সাথে সাথে তালাক দেয়ার পর পুণরায় প্রথম স্বামীর সাথে বিয়ে), তা জঘণ্য পাপাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। হযরত আলী (রাঃ), ইবনে মাসুদ (রাঃ), আবু হুরায়রা (রাঃ) ও ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) হতে সর্ব সমর্থিত হাদীসের ভিত্তিতে জানা যায় যে, এ ঘৃণ্য পন্থায় যারা বিয়েকে হালাল করে এবং যারা করায় উভয়ের প্রতি নবী করিম (সাঃ) অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তালাক প্রথাটি অকল্যাণের জন্য নয় বরং বিপর্যস্ত দাম্পত্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ইহা একটি কল্যাণকর ঘৃণ্য পথ। যারা এর অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ করছেন এ বিকৃতির সাথে ইসলামের তালাক প্রথার কোন সম্পর্ক নেই। আর এ বিকৃতিকে যারা ইসলামের বিধান বলে অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছেন সে কুমতলববাজ তথা ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা আজ প্রত্যেক ইসলামপ্রিয় মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

পর্দা প্রথা

মহান আল্লাহপাক পৃথিবীতে মানুষকে বিপর্যয়হীন নিরুদ্বিগ্ন তথা কল্যাণময় জীবন যাপনের জন্য যত গুলো পথ নির্দেশ দান করেছেন, তার মধ্যে পর্দা প্রথা একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। মানব সমাজকে চরম অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষার জন্যই তিনি পর্দাকে নারী-পুরুষের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন। কারণ পর্দাহীনতার ফলে সমাজ এতদূর বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে, শেষ পর্যন্ত মানুষকে সমাজ গঠনমূলক কাজ বাদ দিয়ে ঐ বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে পরিত্রাণের ব্যর্থ চেষ্টায় নিজেদের মেধা-শ্রমকে ব্যয় করতে হয়, যা সমাজ গঠন তথা প্রগতির জন্য এক বিরাট অন্তরায়। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় যে, সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ মহান কল্যাণকর এ ব্যবস্থাটিকেই আজ অবরোধ, প্রগতি পরিপন্থী, নারী শিক্ষার অন্তরায় তথা নারী সমস্যার মূল কারণ বলে চিহ্নিত করছেন। তারা এ দাবির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দেয়া বিধানের প্রতি একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন, অন্যদিকে অপপ্রচারের মাধ্যমে পর্দা সম্পর্কে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। অথচ তাদের এ দাবি যে কত ভ্রান্ত ও অন্তঃসারশূণ্য, তা তাদের উত্থাপিত দু'একটি অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করলেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

নারী শিক্ষা বনাম পর্দা প্রথা ঃ

সমাজে নারী শিক্ষার পশ্চাদপদতার জন্য যারা ইসলামের মহাকল্যাণকর পর্দা প্রথাকে দায়ী করছেন এবং তা রহিত করার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করছেন, তাদের এ দাবি যে পর্দার বিধান সম্পর্কিত অজ্ঞতা ও পর্দার আবশ্যকতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব থেকেই উৎপত্তি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী হলে তারা এ অন্যায় দাবি করতে পারতেন না এবং পর্দা প্রথা নয়; বরং পর্দাহীনতাই যে নারী শিক্ষার পথে আজ প্রধান অন্তরায়, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হতো না।

আমরা জানি যে, কোরান মজিদে আল্লাহপাক নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞান অর্জনকে ফরজ করে দিয়েছেন। সে কোরান-হাদীসেই আবার তিনি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য পর্দা ফরজ করেছেন। সুতরাং এ দু'টোর মধ্যে কোন বিরোধ থাকতে পারে না এবং একটি অপরটির সহায়ক ভিন্ন প্রতিবন্ধকও হতে পারে না।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহপাক তোমাদিগকে (নারীদেরকে) অনুমতি দিয়েছেন যে, তোমরা প্রয়োজন অনুসারে বাইরে যেতে পার।' (বুখারী) এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞান অর্জনের মত একটি ফরজ কাজ সম্পাদনের জন্য নারীরা বাইরে যেতে না পারার কোন প্রশ্নই আসে না। তবে তা যেতে হবে পর্দা রক্ষা করে। কারণ, আল-কোরআনেই আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, "হে নবী! আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মুসলমান নারীদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের ওপর নিজেদের চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়। এটা অধিক উত্তম নিয়মরীতি। যেন তাদেরকে চিনতে পারা যায় এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়।' –(আহযাব-৫৯)। আর একটি আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেছেন, 'আর তারা যেন নিজেদের যিনাত (সৌন্দর্য) প্রকাশ না করে, তবে যা স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে, তার কথা স্বতন্ত্র।'– (সূরা আন-নূর)। অন্যত্র বলেছেন, 'হে নবী! মুমেন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন অপর স্ত্রীলোক হতে তাদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখে এবং স্বীয় লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করে। এটা তাদের জন্য পবিত্র পন্থা। তারা যা করে, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। হাদীসে আছে হে মানব সন্তান তোমার প্রথম দৃষ্টি ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু সাবধান দ্বিতীয়বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না।'

কোরান-হাদীসের উপরোক্ত নির্দেশগুলো থেকে কএকথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নারীদের ঘরের বাইরে বের হওয়ার মূল উদ্দেশ্যকে নিরাপদে সফল করার এবং তাদের মান-সম্ভ্রমকে সুরক্ষার স্বার্থেই মহান আল্লাহপাক পর্দা রক্ষা করে চলার ও সৌন্দর্য প্রদর্শন না করার নির্দেশ দিয়েছেন। পর্দা নারীদের জন্য সম্মানজনক ও আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা আর পর্দা শুধু নারীদের জন্যই নয়, পুরুষের জন্যও।

আজকের বাস্তবতা তথা সমাজের প্রতি যদি আমরা দৃষ্টি দেই, তবে উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যাসত্য এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত এ বিধানের অপরিহার্যতা যে কত সুপরিজ্ঞাত ও সুস্পষ্ট তা প্রতিভাত হয়ে উঠবে। কারণ, আজকের সমাজে আমরা এ মহাকল্যাণকর বিধানকে খুব কমই গুরুত্ব দিচ্ছি। খুব কম সংখ্যক লোকই তা অনুসরণ করছে। কিন্তু এ অবহেলার পরিণতি যে কত ভয়াবহ, তা প্রতিদিনের সংবাদপত্রের কিছু কিছু দুঃখজনক সংবাদেই যথেষ্ট– যা আমাদেরকে আতংকগ্রস্ত করে তুলেছে। যা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনবরত লেখালেখি হচ্ছে। প্রতিবাদ সভা,

সেমিনার, সিম্পোজিয়াম থেকে শুরু করে প্রতিরোধ কমিটি পর্যন্ত গঠন করতে হয়েছে। সরকারকেও নতুন নতুন আইন তৈরী করতে হয়েছে। কিন্তু তাতেও ফল হচ্ছেনা; বরং ক্রমবর্ধমান হারে আমাদেরকে দুঃখজনক ও লোমহর্ষক সংবাদ শুণতে হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে পাশ্চাত্যের কলুষিত জীবনধারাও এ মহান নিয়ম-নীতি সংঘনের কুফল বৈকি!

এদিক থেকে চিন্তা করলে আল্লাহ্ প্রদত্ত এ বিধানকে অবরোধ, প্রগতি পরিপন্থী, 'ব্যাকডেটেড' বলে আখ্যায়িত করে তা পরিহার করার মত ধৃষ্টতা সত্যিকার চিন্তাশীল, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ও আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিদের না থাকারই কথা।

একদিকে সমাজে অবস্থানরত মানুষের নৈতিক চরিত্র বিধ্বংসী বহুবিধ মাধ্যম, অন্যদিকে শিক্ষা ক্ষেত্রে সহশিক্ষা তথা অবাধ মেলামেশার পরিণতির দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো, বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী অপরিপক্ক বয়সের কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে গড়ে উঠেছে অবৈধ প্রেম-ভালবাসা। পরিণতিতে একদিকে যেমন যার যার লেখাপড়া ও কর্মক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে অবহেলা, অমনোযোগিতা ও নৈরাশ্য, তেমনিভাবে আবার অপরিপক্ক প্রেম-ভালবাসার ব্যর্থতায় বহু অঘটন ও অকল্যাণকর ঘটনা নিত্যদিন সংঘটিত হচ্ছে। হত্যা, আত্মহত্যা, এসিড নিক্ষেপ, কিশোরী ধর্ষণ, ছাত্রী অপহরণ, কুমারী মাতাদের আর্তনাদ ইত্যাদি অসংখ্য ঘটনা নিত্য-নৈমিত্তিক সংবাদ হয়ে আসছে। এর অশুভ পরিণতি শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়, পরবর্তীতে সংসার জীবনেও পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা ও পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস শেষ পর্যন্ত নির্যাতন ও বিচ্ছেদে গিয়ে ঠেকছে বড়ই সকরুণভাবে।

অন্যদিকে সমাজের এ করুণ চিত্র প্রত্যক্ষ করে, নিজেদের ও সন্তানের মান-মর্যাদা ও ইজ্জতের কথা ভেবে অনেক শিক্ষিত, ধার্মিক ও বিবেকবান ব্যক্তি বিশেষ করে গ্রাম সমাজে শিক্ষার মত মহামূল্যবান প্রয়োজন থেকে মেয়েদেরকে বঞ্চিত করতে ও লেখাপড়ায় ইতি টানতে বাধ্য হচ্ছেন। আর সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষদের তো কথাই নেই। অবস্থাটা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, বাবা-মা মেয়েকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে বাসায় ফিরে না আসা পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছেন না। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠবে, তবে কি নারীদেরকে ঘরে বসেই থাকতে হবে?

এর আগে একটি কথা সকলকে বুঝতে হবে যে, পর্দা নারী শিক্ষা ও প্রগতির

অন্তরায় নয়; বরং সহায়ক। অন্তরায় হলো নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য দীর্ঘদিনের অবহেলা ও পরিকল্পিত কার্যক্রমের। যুগ যুগ ধরে নারী শিক্ষার উন্নয়নের প্রতি উদাসীনতা ও পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ না করার ফলেই নারী শিক্ষার হার আজ এতো নিম্নে। পরিকল্পিত উপায়ে যদি নারীদের জন্য ব্যাপক হারে স্বতন্ত্র স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইউনিভার্সিটির ব্যবস্থা করা হতো, তবে মুসলিম দেশগুলোতে নারী শিক্ষার মান এতো নিম্নে থাকার কথা নয়। আর সহশিক্ষা ও অবাধ মেলামেশার ফলে সামাজিক সমস্যা, সামাজিক বিপর্যয় তথা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা ও অবহেলা এতো ব্যাপক হারে দেখা দিত না। মান-সম্মান নিয়ে আশংকাগ্রস্ত ও ধর্মীয় অনুভূতিশীল পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনেরও মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে এ অনীহা ও দুশ্চিন্তার কারণ থাকতো না। সুতরাং পর্দা প্রথা নয়; বরং পর্দাহীনতাই যে আজ নারী শিক্ষার প্রধান অন্তরায় ও নারী সমাজের প্রতি মারাত্মক হুমকী হিসেবে দেখা দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ যে নারীদের জন্য সকল ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থার মাধ্যমে সহশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়া এবং পর্দা ব্যবস্থার সুরক্ষা করা, এতেও আর কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়।

আমাদের তথাকথিত নারীমুক্তি আন্দোলনের নেতা-নেত্রী তথা পর্দা বিরোধীরা যত তাড়াতাড়ি এ সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন তত তাড়াতাড়ি সমাজে বয়ে আসবে মঙ্গল। কারণ, এতে অভিভাবক শ্রেণী একদিকে যেমন দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে নারী শিক্ষার প্রতি উৎসাহী হবে, অন্যদিকে নারী শিক্ষার হারও দ্রুত উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাবে। আর আমাদেরকেও যে এত ব্যাপক হারে দুঃখজনক সংবাদ শুনতে হবে না, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

নারী নির্যাতন বনাম পর্দা ঃ

নারী নির্যাতন আজ সমাজে এমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে যে, এ সম্পর্কে নতুন করে পরিচয় তুলে ধরার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা। দীর্ঘদিনের বাস্তব অবলোকন ও পত্র-পত্রিকা থেকে এর বীভৎস ও কুৎসিত রূপ সম্পর্কে কম বেশী সবাই পরিচিত।

সভ্যযুগে সভ্যতার ভিত্তিমূলে জাহেলী যুগের এ বর্বরোচিত হামলায় নির্যাতিত নিষ্পেষিত মানবতার ক্রন্দন শুনে আমাদের সভ্যতার ধারক বাহকেরা চুপচাপ বসে থাকেনি। তারা পতনঘন্টা হাতে দাঁড়িয়ে ন্যূজ সভ্যতাকে প্রাণশক্তি দিয়ে শেষ রক্ষার চেষ্টার যারপর নাই চেষ্টিত। আর সে লক্ষ্যে এ বর্বরতার প্রতিরোধকল্পে

পত্র-পত্রিকায় অনবরত লেখালেখি, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম থেকে শুরু করে প্রতিরোধ কমিটি গঠন এবং নতুন নতুন আইন সৃষ্টি করে চলেছেন। কিন্তু এসব কিছুতেও কিছুমাত্র উপশম করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না; বরং উত্তরোত্তর নির্যাতন-নিষ্পেষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যথেষ্ট আন্তরিকতা ও চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও এ ব্যর্থতার হেতু অন্বেষণ করতে গিয়ে বলতে হয় যে, আজো এ বর্বরতার সঠিক কারণ নির্ণয় এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে না পারায় ব্যর্থতাই এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

আমাদের তথাকথিত নারীমুক্তি ও প্রগতিবাদীরা এ পর্যন্ত নারী নির্যাতনের পেছনে দারিদ্রতা ও অশিক্ষাকেই মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে আসছেন। কিন্তু একটু ভাবলেই দেখা যাবে যে, দারিদ্র ও অশিক্ষা নির্যাতনের পেছনে ক্রিয়াশীল থাকলেও একেই মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা মোটেই যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত নয়। কারণ, দারিদ্র ও অশিক্ষাই যদি মূল সমস্যা হতো, তবে বিচ্ছেদ ও নির্যাতন দরিদ্র পরিবারেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা ছিল; কিন্তু তা মোটেই থাকেনি। তাছাড়া শিক্ষা ও স্বচ্ছলতাই যদি আসল প্রতিরোধক হত হবে বৃটেন ও আমেরিকার মত দেশে ধর্ষণসহ যৌন অপরাধের কোন ঘটনাই ঘটত না বা বিবাহ বিচ্ছেদের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যেত না। আর দারিদ্রের কারণে বিচ্ছেদ বা নারী নির্যাতন ঘটে থাকলে কিশোরী ধর্ষণ, ছাত্রী অপহরণ, কুমারী মাতাদের আর্তনাদ এবং এসিড নিক্ষেপের মত লোমহর্ষক ঘটনাগুলোই বা কেন ঘটছে? আমাদের দেশে সালেহা হত্যা, মনির কর্তৃক রীমার এ চাঞ্চল্যকর হত্যাকান্ডই বা কেন সংঘটিত হলো?

সুতরাং তথাকথিত প্রগতিবাদীদের দ্বারা চিহ্নিত মূল কারণ যে অযৌক্তিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসল কারণকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বলতে হয় যে, আমাদের নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ আজ দ্রুত ধসে যাচ্ছে। একদিকে নীতি ও নৈতিকতাবোধের অধঃপতন, অন্যদিকে আধুনিকতা ও প্রগতির নামে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলেই সমাজে ক্রমবর্ধমান হারে লোমহর্ষক ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে, সমাজ ধ্বংসের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি সমাজে আজ সামাজিক অবকাঠামো, অশিক্ষা-কুশিক্ষার প্রচলণ, অপসংস্কৃতির চর্চা ও নৈতিকতা বিধ্বংসী সমাজে অবস্থানরত শত-সহস্র মাধ্যম হেতু এসবের অনিবার্য বিষক্রিয়ায় সমাজে এমন এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাণহীন, দেহসর্বস্ব, ভোগবাদী মানুষ নামক হিংস্র পশুর সৃষ্টি হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান হারে হতে চলেছে– যারা নারীদেরকে ভোগ্যপণ্য ব্যতীত আর কিছুই ভাবতে পারছে না বা ভাবার ক্ষমতা

হারিয়ে ফেলেছেন। সুতরাং নৈতিক ও চারিত্রিক এ অধঃপতনের কারণে এরা শুধু বিয়েই নয়, যৌন ক্ষুধা নিবারণের অন্য যে কোন সুযোগকেও গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত নয়।

ফ্রি মিক্সিং তথা অবাধ মেলামেশার সুযোগ এদের স্বর্গ রচনা করে দিয়েছে। এরা পারিবারিক গন্ডিতে আবদ্ধ থেকে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য মাথায় নিয়ে বৈধ উপায়ে যৌন চাহিদা মেটাতে বা শুধু এতেই তৃপ্ত নয়। নৈতিক পদস্খলনের জোয়ারে এদের অন্তরের প্রেম-ভালবাসা, পারিবারিক সুখ-শান্তির মোহ সবকিছুই ভেসে গেছে। অবাধ মেলামেশা, উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা তথা ঘরের বাইরে প্রকাশ্যে বা গোপনে যৌন ক্ষুধা নিবারণের একাধিক মাধ্যম হেতু এ শ্রেণীর পুরুষ বা নারী ঘরে ফেরার তাড়া অনুভব করছে না. এবং পারিবারিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে স্ত্রী-সন্তান-সংসার বা স্বামী-সন্তান-সংসারের প্রতি অবহেলা হেতু একপক্ষ থেকে যখনই অপর পক্ষের অবৈধ আচরণে সন্দেহ বা বাধা আসে,তখনই শুরু হয় মনোমালিন্য, কথা কাটাকাটি,নির্যাতন। অবশেষে একসময় চরম রূপ ধারণ করে হত্যা,আত্মহত্যা এবং বিবাহ বিচ্ছেদের মত জঘন্যতম ঘটনাও সংঘঠিত হতে দেখা যাচ্ছে। যার পরিণতিতে নিস্পাপ সন্তানদের ওপর নেমে আসছে অনিশ্চয়তার খড়গহস্ত।

শুধু তাই নয়, মানবরূপী এসব হিংস্র পশুরা আপন ঘরকে যেমনিভাবে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করছে, তেমনিভাবে অবাধ মেলামেশার সুযোগে অপরের শান্তির নীড়েও আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছুড়ে মারতে সিদ্ধহস্ত। যার পরিণতিতে অসংখ্য সুখের নীড় আজ দাউ দাউ করে জ্বলছে, পারিবারিক শান্তির ভিত্ কেঁপে উঠেছে এবং অহরহ অসংখ্য বিচ্ছেদ ও পাশবিক ঘটনা সংঘঠিত হচ্ছে। (পরিসংখ্যান নিলে হয়তো জানা সম্ভব হতো এ পর্যন্ত পরকীয়া প্রেমের অনলে কতটি বিচ্ছেদ ও লোমহর্ষক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে)। অন্যদিকে এ শ্রেণীর পুরুষদের মিথ্যা আশ্বাসে কত সহস্র জীবন প্রদীপ যে অকালে নিভে গেছে তার হিসাব নেই। এদের মিথ্যে আশ্বাসের ফাঁদে পা দিয়ে আজ জরিনা, মমিনা, সখিনারা সন্তানের পিতৃ পরিচয়ের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে, অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরছে।

যৌতুক প্রথা ঃ

যৌতুক প্রথা আজ আমাদের সমাজে এক মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি হিসেবে দেখা দিয়েছে। যৌতুকের দায়ে শত শত ঘর ভাঙছে। সুখের স্বপ্ন কল্পনায় বিভোর অসংখ্য অবুঝ প্রাণ জীবনের শুরুতেই মানুষ নামক নরপশুদের হিংস্র থাবায়

অকালে ঝরে গেছে। বহু জীবন অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়িয়েছে। যৌতুকের অভিশাপে বাবা-মা আজ তার অতি আদরের কন্যাকে বোঝা হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে। কিন্তু কেন আজ সমাজে যৌতুক নামক লোলুপ দৃষ্টি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে?

যেখানে একজন যুবক তার জীবনের সবচেয়ে পরম বন্ধুকে বিবাহের মাধ্যমে বরণ করবে, যে তার সুখে-দুঃখে সর্বত্র সহমর্মী হবে, যার সান্নিধ্যে তাকে সারাজীবন অতিবাহিত করতে হবে, সে পরম বন্ধুকে মর্যাদার সাথে বরণ না করে তার গলায় অমর্যাদার গ্লানি পরিয়ে দিয়ে আগে বরণ করে সে যৌতুক।

এর কারণ হিসেবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও যুক্তি দেয়া হচ্ছে। এগুলোর পেছনে কিছুটা সততা নিহিত থাকলেও মুখ্য কারণ হিসেবে সরকারের নীতিবিগর্হিত সিদ্ধান্ত এবং ঐসব নেতৃস্থানীয় নারী-পুরুষদেরই দায়ী করবো। একদিকে যখন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও ছত্রছায়ায় সমাজে অবস্থানরত চরিত্র বিধ্বংসী বহুবিধ মাধ্যম হেতু যুবক-যুবতীরা ধ্বংসের সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে, তখন যারা নিরব– যাদের মুখ থাকে বন্ধ, অথচ অন্যদিকে আধুনিকতা ও প্রগতির নামে নারীদের পুরুষের ভোগের সামগ্রী হিসেবে ছুড়ে দিচ্ছেন এবং তার জন্য ওকালতি করছেন। যারা ক্ষত সৃষ্টি হলেই শুধু চিৎকার দিয়ে রাস্তায় নেমে আসেন, অথচ কেন সৃষ্টি হচ্ছে সে নিয়ে মাথা ব্যাথা নেই।

এসব মুষ্টিমেয় নারী-পুরুষদের খামখেয়ালীপনার জন্যই গোটা নারী সমাজকে আজ তার খেসারত দিতে হচ্ছে। অবাধ মেলামেশার সুযোগে পুরুষেরা, নারীদের স্বেচ্ছায়-অনিচ্ছায় প্রতারণার মাধ্যমে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার নামে যত্রতত্র ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করছেন। তাছাড়া সরকারী ছত্রছায়ায় প্রকাশ্য বা গোপনে নারীদের দিয়ে গড়ে ওঠা যৌন ক্ষুধা নিবারণের একাধিক মাধ্যম হেতু বিভ্রান্ত পুরুষদের যৌন ক্ষুধা নিবারণের পথ আরো উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এতে নারী সমাজের মান-মর্যাদা একদিকে যেমনিভাবে সুকৌশলে ধ্বংস করা হচ্ছে, অন্যদিকে যে দুর্বার আকর্ষণে একজন যুবক তার জীবনের সবচেয়ে পরম বন্ধুকে অপরিসীম মর্যাদায় বরণ করবে, পার্থিব সব চাওয়া-পাওয়ার চেয়ে স্ত্রী হবে তার কাছে মর্যাদাবান। নববধূর কাছে অন্য সবকিছু হবে তার তুচ্ছজ্ঞান। আজ এক শ্রেণীর যুবক তো সে আকর্ষণ অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছে এবং হারাতে বসেছে। নিজেকে তো সে বিকারগ্রস্ত হিসেবে গড়ে তুলেছে। তার সে ত্যাগ শক্তি তো অনেক আগেই খুইয়ে ফেলেছে। ক্ষণিকের প্রেয়সীরা তার পরও ওঁৎ পেতে আছে। সুতরাং কিইবা পাওয়ার বাকী আছে নববধুর কাছে তার– কিছু

অর্থ-সম্পদ আর সোনাদানা ছাড়া! আর কিইবা নববধূক দেয়ার আছে তার– কিছু অপমান, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা, লাঠিপেটা আর ফাঁসির রজ্জু ছাড়া!

তাই আজ এটা বাস্তব সত্য যে, নারী যতই সমাজে পণ্যের ন্যায় সহজলভ্য হচ্ছে, ভোগসর্বস্ববাদী পুরুষদের দায়িত্বহীন ভোগের সীমাহীন নেশার কাছে দায়িত্বসর্বস্ব, বৈধ পবিত্র পন্থা ততই নিভৃতে মার খাচ্ছে। এদের অবৈধ পন্থায় যখনই স্ত্রীদের থেকে বাধা আসে, যখন সাংসারিক প্রয়োজন ও দায়-দায়িত্বের কথা উত্থাপিত হয়, তখনই তারা স্ত্রী-সন্তান-সংসারকে জঞ্জাল হিসেবে মনে করে। বাইরের পেশাধারী ললনাদের কৃত্রিম রূপের ঝলক সহজ-সরল, সতী-সাধ্বী স্ত্রীদের ওপর প্রতিফলিত হয় অবহেলা, অনীহা, মিথ্যাকল্পিত অভিযোগ, নির্যাতন, নিষ্পেষণ আর সর্বনাশা বিচ্ছেদরূপে। স্ত্রীর বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সুযোগ সৃষ্টির ফলেই আজ এসব নরপশুদের কাছে স্ত্রীরা নির্যাতিত, নিগৃহীত হচ্ছে। আর বিয়ের পরও কল্পিত যৌতুকের দাবী বিভৎস হত্যায় পরিণত হচ্ছে।

এ শ্রেণীর ভোগসর্বস্ব পুরুষ বা নারীর কবলে যে-ই পড়ুক না কেন, বা যে সংসারই গড়ে উঠুক না কেন, তা অনিবার্যভাবে অশান্তি, নির্যাতন ও ভাঙনের ধারায় পৌছে যেতে বাধ্য।

সুতরাং যারা এ সহজ সত্যটিকে এড়িয়ে গিয়ে ভিন্নভাবে সমাধান খুঁজছেন এবং ভিন্ন কারণকে উপস্থাপন করছেন, তারা যে ভুলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। চরিত্র বিধ্বংসী সকল উপায়-উপকরণ এবং ফ্রি মিক্সিং -এর পরিণতিতেই যে আজ নারী জাতির এ দুর্গতির প্রধাণ কারণ, এতে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। আজ এ অভিশাপ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ নৈতিকতা বিধ্বংসী সকল প্রকার উপায়-উপকরণের মুলোৎপাটনসহ ফ্রি মিক্সিং-এর অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্তি দেয়া এবং মহাকল্যাণকর পর্দা প্রথার সুরক্ষা করা। যারা পর্দা প্রথাকে নিয়ে অপপ্রচার করছেন, তারা ধ্বংসের খেলায় লিপ্ত রয়েছেন। এ ধ্বংসের খেলার যতদিন না অবসান ঘটবে, ততদিন নির্যাতন, নিষ্পেষণ, ধর্ষণ, হত্যা, অপহরণ আর চরম অশান্তির অবসানও হবে না।

ধর্ম ও রাজনীতি

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিয়েও এক শ্রেণীর লোক, বিশেষ করে নাস্তিক্যবাদী কমিউনিষ্ট-সমাজতন্ত্রী তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা (কোন কোন ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর আলেম, পীর-মাশায়েখদেরকেও এদের সাথে সুর মিলাতে দেখা যায়) বিভিন্ন বক্তব্য বিবৃতির মাধ্যমে যেমন– ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের সাথে এর কোন যোগসূত্র নেই, ধর্ম একটি পূতঃ পবিত্র জিনিস, একে রাজনীতির সাথে জড়িত করা অন্যায়, ধর্মের নামে রাজনীতি করে পবিত্র ধর্মকে কলুষিত করা হচ্ছে ইত্যাদি ধরণের প্রচার-প্রপাগান্ডার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছেন। এ প্রচেষ্টায় যে তারা অনেকদূর সফল হয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাদের এ বক্তব্য যদি ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মগুলোর ক্ষেত্রে হতো তাহলে মেনে নেয়া যেত। কারণ, ওসব ধর্মের কোনটিই আজকের যুগ সমস্যার সমাধান উপযোগী পূর্ণাঙ্গ কোন বিধি-বিধান নয় আর ওসব ধর্মের অনুসারী বা ধারক-বাহকেরাও তা দাবি করে না। তাদের কাছে তাদের ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন বৈ কিছু নয়। কিন্তু এ প্রচারণার সাথে যখন সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামকেও সম্পৃক্ত করে অপপ্রচারের মূল টার্গেটে ফেলা হয় এবং এক শ্রেণীর মুসলমানদেরকেই এ প্রচারণার হোতা হিসেবে দেখা যায়, তখন আঁৎকে ওঠা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না এবং সাথে সাথেই ভাবনায় পড়তে হয়– এরা কি ধর্মের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে এবং জেনে-বুঝেই এ কাজ করছে?

আমরা জানি ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বা কমপ্লিট কোড অব লাইফ'। মানব জীবনের এমন কোন দিক বা সমস্যা নেই– যার সমাধান ইসলাম ধর্মে বা কোরআন-হাদীসে দেয়া নেই। আর একজন মানুষকে মুসলমান হতে হলেও প্রথমেই আল্লাহ্‌কে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মেনে নেয়ার শর্তেই মুসলমান হতে হয়, যে ঘোষণা আমরা কালেমা তাইয়্যেবা পাঠের মাধ্যমে দিয়ে থাকি। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার

মাধ্যমে একজন মুসলমান যে চূড়ান্ত ও বিপ্লবী ঘোষণা দিয়ে থাকে তা হলো, 'লা' অর্থাৎ নাই বা মানি না কোন 'ইলাহকে' (ইলাহ শব্দটি দ্বারা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কোন শক্তিকে যেমন- আইনদাতা, হুকুমদাতা, রেজেকদাতা, বিধানদাতা, জীবনদাতা, মরণদাতা ইত্যাদিকে বুঝিয়ে থাকে) 'ইল্লাল্লাহ' একমাত্র আল্লাহ্কে ছাড়া অর্থাৎ আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে 'ইলাহ' বা 'মাবুদ' বা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে স্বীকার করি না। 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'- অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র রাসূল বা মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে যে বিধান দুনিয়ায় এসেছে তা-ই একমাত্র আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান এবং একমাত্র অনুসরণযোগ্য।

উপরোক্ত কালেমার এ বিপ্লবী ঘোষণার মাধ্যমে একজন লোক দুনিয়ার সকল মানুষের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও বিধানকে দ্ব্যর্থহীনভাবে অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহ্র ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও বিধানকে স্বীকার করে নেয়ার সাথে সাথে আমলী শর্ত হিসেবে বা ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় দাবী অনুয়ায়ী যে দু'টি গুরু দায়িত্ব এসে তার ওপর বর্তায়, তা হলো (১) যদি সমাজে পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহ্র আইন বা বিধান কায়েম থাকে, তাহলে একজন মুসলমানের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব হলো, সে আইন বা বিধানকে মেনে চলা এবং তা সমাজে টিকিয়ে রাখার জন্য সদা সচেষ্ট থাকা। (২) আর যদি সমাজে আল্লাহ্র আইন বা বিধান প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তাহলে ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় দাবী হলো, সে আইন বা বিধানকে আল্লাহ্র জমিনে প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ চেষ্টা করা।' এ দুটো দায়িত্ব পালন ব্যতীত মুসলমানদের জন্য ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির কোন বিকল্প পথ নেই। কারণ, প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহ্র আইন ও বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে, কালেমা পাঠের এ শর্তেই আল্লাহ্র কাছে ওয়াদাবদ্ধ।

সুতরাং আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠিত নেই- এমন সমাজে সে কারণে মুসলমানদের জন্য ঈমানী জিন্দেগী যাপনের স্বার্থে তা প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা করা ফরজ। এ চেষ্টার ফলে যদি আল্লাহ্র আইন সমাজে প্রতিষ্ঠিত না-ও হয়, তবুও পরকালে জবাবদিহির একটিমাত্র পথ খোলা থাকবে যে, 'আল্লাহ্! তোমার বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিল না, সে কারণে আমি তা অনুসরণ করতে পারিনি কিন্তু তোমার বিধানকে সমাজে প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছি, এ উছিলায় তুমি ক্ষমা করতে পার।' এ চেষ্টার কারণে হয়তোবা আল্লাহ্ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু এ দু'টো দায়িত্বের কোনটিই যদি একজন মুসলমান পালন না করে, তাহলে পরকালে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহির এবং কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোন বিকল্প পথ থাকবে না।

আজকের সমাজের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ব্যক্তিগত জীবনে মুসলমানদের পক্ষে ইসলামের কিছু বিধি-বিধান অনুসরণ করার সুযোগ থাকলেও পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয় আইন প্রশাসন তথা জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে ইসলামের যেসব বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলো প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে মুসলমানদের পক্ষে তা অনুসরণ করা বা মেনে চলা সম্ভব হচ্ছে না। সমাজের এসব গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো পরিচালিত হচ্ছে মানুষের রচিত বিভিন্ন আইন, মতবাদ ও মতাদর্শ অনুযায়ী। ইসলাম আজ এসব ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। যার পরিণতিতে পুরো সমাজ আজ ইসলাম বিরোধী কার্যক্রমে ছেয়ে আছে। এ অবস্থায় কি একজন মুসলমানের পক্ষে নিরব ভূমিকা পালন করা সম্ভব? নির্বিবাদে কি একজন মুসলমান অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে বসবাস করতে পারে? আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারার ৮৬ নং আয়াতে বলেছেন, "তাহলে কি তোমরা কোরআনের একটি অংশের ওপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশের সাথে কুফরী করছো? তারপর তোমাদের মধ্য থেকে যারাই এমনটি করবে, তাদের শাস্তি এছাড়া আর কি হতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে এবং আখেরাতে তাদেরকে কঠিনতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে? তোমাদের কর্মকান্ড থেকে আল্লাহ্ বেখবর নন। এ লোকেরাই আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে। কাজেই তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তারা কোনো সাহায্যও পাবে না।" সুতরাং ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় দাবি এবং কোরআনের উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী পারার কথা নয়। ব্যতিক্রম ঘটতে পারে শুধু ঈমান তথা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণেই এবং যা হবে প্রতি পদে পদে শিরক ও মোনাফেকীর নামান্তর। যেমন– কেউ যদি কোরানের অর্থনীতির পরিবর্তে আজকের সমাজে মার্কস, লেনিন, মাও সেতুংদের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বা অন্যান্য পুঁজিবাদী ও মিশ্র অর্থনীতিকে মেনে নেয়, আইনের ক্ষেত্রে কোরআনের আইনের পরিবর্তে বৃটিশ-রোমান আইন বা মানুষের তৈরী অন্যান্য কোন আইনকে মেনে নিয়ে অনুসরণ করে, তাহলে বোঝা যায় যে– মার্কস, লেনিন, মাওসেতুং বা অন্যান্য অর্থনীতিবিদরা আল্লাহ্র চেয়েও অনেক বিজ্ঞ ও বড় অর্থনীতিবিদ; বৃটিশ, রোমান বা মানুষের তৈরী অন্যান্য বিধি-বিধান আল্লাহ্র প্রদত্ত কোরআন হাদীসের আইনের চেয়েও অনেক উন্নত, অনেক ভাল (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক)। আর এটাই হলো আল্লাহ্র সাথে চরম শেরেকি এবং কালেমা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহকে প্রদত্ত ওয়াদার সাথে চরম মোনাফেকী। এ শেরেকি ও মোনাফেকী স্বভাব নিয়ে কোন মানুষ প্রকৃত মুসলমান বা ঈমানের

দাবিদার হতে পারে না এবং পরকালে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন পথ থাকবে না।

এ স্বভাব থেকে পরিত্রাণ, পরকালে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা এবং দুনিয়ায় মানবতার কল্যাণের জন্য ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় ফরয দাবী অনুযায়ী অনৈসলামিক সমাজ বা খোদাদ্রোহী সমাজ ব্যবস্থাকে উৎখাত করে আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠার অত্যাবশ্যকীয় সংগ্রাম যদি ঈমানদার মুসলমানরা সংঘবদ্ধভাবে শুরু করে, তবে এ সংঘবদ্ধ ঈমানী আন্দোলনকে কেউ রাজনীতি বলতে পারেন; কিন্তু আজকের সমাজে প্রচলিত রাজনীতির সাথে এক করে ফেলা বা এক চোখে দেখা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হবে না। প্রচলিত রাজনীতি আর ইসলামী রাজনীতি এক নয়। প্রচলিত রাজনীতিতে মানুষ মানুষের ক্ষমতা-কর্তৃত্ব, মানুষের তৈরী আইন, মতবাদ-মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। ভোগবাদী ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দুনিয়ার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও স্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে।

পক্ষান্তরে ইসলামী রাজনীতি বা ইসলামী আন্দোলন দুনিয়ায় মানুষের কোন ক্ষমতা বা কর্তৃত্বকে স্বীকার করে না। জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে মানুষের প্রভূত্ব, ক্ষমতা-কর্তৃত্ব, মানুষের তৈরী আইন, মতবাদ-মতাদর্শকে উৎখাত করে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রভূত্ব, ক্ষমতা-কর্তৃত্ব তথা আল্লাহ্‌র আইন-কানুনকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। এ প্রচেষ্টা তার ঈমানী চেতনা ও বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। এটা তার ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় বা ফরয দায়িত্ব। দুনিয়াবি স্বার্থ চিন্তা তাড়িত হয়ে এ আন্দোলন করা যায় না। একমাত্র পরকালীন স্বার্থ এবং কালেমার বিপ্লবী ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে প্রদত্ত ওয়াদার মর্যাদা রক্ষা ও মোনাফেকী আচরণের হাত থেকে পরিত্রাণের উদগ্র বাসনা তথা আল্লাহ্ প্রেমই এ আন্দোলনের একমাত্র প্রেরণা বা বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং যারা প্রচলিত ভোগবাদী ও বস্তুবাদী রাজনীতির সাথে ইসলামী আন্দোলন তথা ইসলামী রাজনীতিকে এক করে দেখেন বা দেখতে চান, প্রচলিত ভোগবাদী রাজনীতিবিদদের অপবাদ ও অপকর্মের দায়ভাগকে রাজনীতির নামে ইসলামী আন্দোলনের উপরও ছাপিয়ে দিতে চান অথবা কোন স্বার্থবাদীদের স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে পবিত্র ইসলামকে ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট অপকর্মের দায়ভাগকে ইসলামের ওপর অথবা প্রকৃত ইসলামী আন্দোলনের ওপর অপবাদ হিসেবে চাপিয়ে দিয়ে মানুষকে ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান, তারা হয় ইসলামী আদর্শ ও ঈমানী দায়িত্বকে না বোঝার কারণে নতুবা ইসলাম বিদ্বেষীদের ক্রীড়নক হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করছেন।

আর যারা ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে এর কোন যোগসূত্র নেই, ধর্মের নামে রাজনীতি করে পবিত্র ধর্মকে কলুষিত করা হচ্ছে বলে রাজপথে চিৎকার দিয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষকে বোকা বানাতে চান, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এ মতবলববাজী বক্তব্য দিয়ে সাময়িকভাবে কিছু কিছু মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখতে সক্ষম হলেও আপনাদের মতলবী চাল ধর্মপ্রাণ মানুষদের বুঝতে বেশী সময়ক্ষেপণ হবে না। এ তলববাজী বক্তব্যের মাধ্যমে আপনারা মানুষের ঈমান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন; ঈমানী দায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে রেখে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পরিবর্তে মানুষের ওপর মানুষের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে চাপিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে জুলুম, ব্যভিচার, অনাচার-পাপাচার থেকে শুরু করে খোদাদ্রোহী কার্যক্রমের সয়লাবে আজ জনতা হাবুডুবু খাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য ধর্মপ্রাণ জনতার সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে ইসলামী আন্দোলনই বলুন আর ধর্মীয় রাজনীতিই বলুন, ঈমানী দায়িত্বের বাঁধভাঙা জোয়ারের বেগবান তোড়ে আল্লাদ্রোহী সমাজ ব্যবস্থা মূলোৎপাটিত হয়ে চির কল্যাণ আর চির শান্তির ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে– এ বিশ্বাস আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আল্লাহ্ মানুষকে ঈমানী সচেতনতা দান করুন–আমীন।

মুসলমান বনাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে নিয়েও আজ আমাদের সমাজে বাক-বিতন্ডা চলছে। এক পক্ষ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে এর অন্তর্ভূক্তি চান। অপরপক্ষ এর চরম বিরোধী। যারা সংবিধানে এর অন্তর্ভূক্তি চান, তারা বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখালেখির মাধ্যমে 'সেকিউলারিজম' বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদই ইসলামের মূলনীতি বলে প্রচার করছেন এবং ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হওয়া উচিত বলে মনে করেন। এর স্বপক্ষে তারা কোরআন-হাদীস থেকেও উদ্বৃতি দিতে কসুর করেন না।

কিন্তু তাদের এ বক্তব্য কি আসলেই সঠিক? একজন মুসলমান কি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী হতে পারে? ইসলাম কি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে অনুমোদন করে?– এ প্রশ্নের সমাধান পেতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কি এবং ইসলামের মৌলিক আদর্শইবা কি।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইংরেজী 'সেকিউলারিজম' শব্দের বাংলা অনুবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মীয় প্রবণতা বা ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ্ ও রাসূলের তথা ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নামই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। অর্থাৎ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইন-বিচার ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলো আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের কোন কর্তৃত্ব কোন হুকুম বা বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হতে পারবে না। এসব সামাজিক দিকগুলো পরিচালিত হবে মানুষ এবং মানুষের তৈরী আইন ও বিধান দ্বারা। আর আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষরা সীমাবদ্ধ থাকবেন মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা ইত্যাদির মধ্যে। অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু ইবাদত-বন্দেগী, যিকির-আযকার ইত্যাদিতেই আল্লাহ্ ও রাসূলকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, এর বাইরে হাত বাড়ানো চলবে না। এ হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল কথা।

আর ইসলামকে আমরা জানি শান্তির ধর্ম হিসেবে এবং ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বা কমপ্লিট কোড অব লাইফ' –একথা আমরা সকলেই জানি এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাও কথায় কথায় বলে থাকেন এবং তা স্বীকার করেন। আল্লাহ্ মানুষকে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য এ বিধান দান করেছেন। মানব জীবনের এমন কোন সমস্যা নেই, যার সমাধান ইসলাম বা আল-কুরআন ও হাদীসে নেই।

একজন মানুষকে মুসলমান হতে হলে প্রথমেই আল্লাহ্কে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মেনে নেয়ার শর্তেই মুসলমান হতে হয়। কালেমা তাইয়্যেবা পাঠের মাধ্যমে একজন মুসলমান সে ঘোষণাই দিয়ে থাকে। এ বিষয়ের ওপর পূর্বের নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। নতুন করে আর বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

সুতরাং কালেমা পাঠের মাধ্যমে ঈমান আনার সাথে সাথে যে সমাজে পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত নেই এমন সমাজে আমলী শর্ত এবং ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় দাবি অনুযায়ী জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লার বিধান প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা করা একজন মুসলমানের জন্য ফরয। এ ফরয তথা ঈমানের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব মাথায় নিয়ে একজন মুসলমানের পক্ষে কি ধর্মনিরপেক্ষ–তাবাদে বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব? বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে একজন মুসলমানের পক্ষে কি ইসলামী ও ঈমানী যিন্দেগী যাপন তথা আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠার অত্যাবশ্যকীয় ফরয দায়িত্ব পালন করা সম্ভব?

কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নীতি অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মের কোন প্রভাব বা কর্তৃত্বকে স্বীকার করা হয় না, ধর্মীয় আইন ও নীতি অনুযায়ী সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালিত হয় না এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল তথা ধর্মীয় আইন-আদর্শ প্রতিষ্ঠার যে কোন আন্দোলন বা প্রচেষ্টাকে আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করে কঠোর হস্তে দমন করা হয়, যার প্রমাণ বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে অন্তর্ভূক্ত করে এর নীতি অনুযায়ী ধর্মভিত্তিক সবগুলো রাজনৈতিক দলকে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। বর্তমানেও ঐ দলটি বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তারা ক্ষমতায় যেতে পারলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করে সকল ধর্মীয় রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার হুমকি দিয়ে চলছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম সকল সমস্যার সমাধানযোগ্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বিধায় এবং সকল মুসলমান পূর্ণাঙ্গভাবে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী

সমাজে পরিচালিত হবে– এ মর্মে আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদাবদ্ধ ও যে সমাজে আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠিত নেই, সে সমাজে আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ফরয দায়িত্ব বিধায় এখানেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে ইসলামের দ্বন্দ্ব অত্যাসন্ন হয়ে পড়ে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এ ফরয দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কঠোর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং একজন প্রকৃত মুসলমান কিছুতেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী হতে পারে না বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাষ্ট্রে বিনা দ্বন্দ্ব বা বিনা প্রতিবাদে বসবাস করতে পারে না। এর ব্যতিক্রম হতে পারে শুধু ঈমান ও ইসলামকে না জানার তথা ঈমান দুর্বলতার কারণে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একজন মুসলমান তথা মুসলিম অধ্যুষিত একটি দেশের জন্য যে একটি কুফরি মতবাদ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে, আজকের মুসলিম দেশগুলোতে অগণিত মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের খপ্পরে পড়ে নিজেদের ঈমানী, ধর্ম তথা গভীর বিশ্বাসকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। পরকাল ও ধর্মে বিশ্বাসী একজন মুসলমানের জন্য এ যে কতবড় আত্মঘাতিমূলক সর্বনাশা খেলা, তা বিবেকবান ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ইসলাম সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞান এবং ঈমান সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধি না থাকার কারণেই তারা সহজেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মিথ্যা প্রচারণার স্বীকার হয়ে অন্ধত্বের ঘোরে হাবুডুবু খাচ্ছেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাও এ অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কুফরী মতবাদের স্বপক্ষে কোরআন-হাদীসের মিথ্যা ও বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে আরো বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন। তারা বক্তৃতা-বিবৃতি এবং কথায় কথায় বলে থাকেন যে, কোরআন-হাদীসেই নাকি ধর্মনিরপেক্ষতার স্বপক্ষে বলা হয়েছে। এর প্রমাণস্বরূপ তারা সূরা কাফেরূণের শেষ আয়াত অর্থাৎ 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন' (তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমার ধর্ম) কথায় কথায় আওড়িয়ে থাকেন। কিন্তু এ সূরা সম্পর্কে যারা অবহিত, তারা নিশ্চয়ই জানেন যে, তাদের এ মিথ্যা ব্যাখ্যা ও দাবীর সাথে এ সূরার বক্তব্যের বিন্দুমাত্র মিল তো দূরের কথা বরং তা সম্পূর্ণ বিপরীত।

মক্কার কাফেররা যখন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে তাঁর ধর্ম প্রচারে চরম বিরোধীতা ও বাধাদান সত্ত্বেও দ্বীনি দাওয়াত থেকে নিবৃত করতে সক্ষম হয়নি, তখন তারা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে দ্বীনি দাওয়াত থেকে বিরত হওয়ার শর্তে প্রচুর ধন-সম্পদ দান, মক্কার শ্রেষ্ঠ যে কোন সুন্দরী মেয়ের সাথে বিবাহ সম্পন্ন করা

এবং তাদের দেব-দেবীর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা বা সমালোচনা করবে না– এ শর্তে তাঁর নেতৃত্ব মেনে চলা বা রাষ্ট্র ক্ষমতা দান ইত্যাদি প্রস্তাব নিয়ে হাজির হতো। কিন্তু এসব লোভনীয় প্রস্তাবেও তাঁর কাছ থেকে কোন অনুকূল সাড়া না পেয়ে তারা সর্বশেষ সন্ধি প্রস্তাব অর্থাৎ 'আপনি এক বছরকাল আমাদের দেব-দেবীর ইবাদাত করবেন, আর এক বছরকাল আমরা আপনার মাবুদের উপাসনা করবো'–এ প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়। তাদের এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতেই মহান রাব্বুল আলামিন সূরা কাফেরূণ নাজিল করেন। যে সূরায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয় যে– বলে দাও, হে কাফেররা! আমি সেসবের ইবাদত করি না যাদের ইবাদত তোমরা কর। আর না তোমরা তাঁর ইবাদাত কর, যাঁর ইবাদত আমি করি। আমি তাদের ইবাদত করতে প্রস্তুত নই, যাদের ইবাদত তোমরা করেছ। আর না তোমরা তাঁর ইবাদত করতে প্রস্তুত, যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) আর আমার জন্য আমার দ্বীন।

উপরোক্ত সূরা কাফেরূণের এ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার সাথে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা তাদের কুফরী মতবাদের কোথায় মিল খুঁজে পেলেন, তা বোধগম্য নয়। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠার পথে চরম প্রতিবন্ধক এ ধরণের একটি জঘণ্য মতবাদকে ইসলাম অনুমোদন করবে– তা কি করে সম্ভব? সুতরাং তারা যে মিথ্যা প্রচার করছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ইসলামকে সাম্প্রদায়িক বলে গালি দিয়ে থাকে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ইসলাম সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। ইসলাম সকল ধর্মের সহাবস্থানে বিশ্বাসী। কোন দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলেও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উদ্বেগের কিছু নেই। কারণ, ইসলাম ধর্মেই অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের স্ব-স্ব ধর্ম পালনসহ সকল প্রকার নাগরিক অধিকার ভোগের পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত। একজন মুসলমান ও একজন অমুসলমানের মধ্যে নাগরিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে ইসলাম কোন পার্থক্য সৃষ্টি করেনি। তাদের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার সমুন্নত রাখতে ইসলাম অত্যন্ত কঠোর। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "মনে রেখো, যদি কোন মুসলমান কোন অমুসলিম নাগরিকের ওপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার ওপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা তার কোন বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহ্‌র আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করবো।– (আবু দাউদ শরীফ)

সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের এসব মিথ্যা ও বিকৃত প্রচারণার খপ্পর থেকে

আত্মরক্ষা করা প্রতিটি মুসলমানের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। তারা মুসলমানের ঈমান-আকীদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। প্রাণপ্রিয় ধর্মের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার চালিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে ফেলতে সক্ষম হয়েছে বলেই তারা আজ তাদের ভোগবাদী ও বস্তুবাদী জীবন দর্শন তথা মানুষের ওপর মানুষের প্রভূত্বকে চাপিয়ে দিয়ে শোষণ, জুলুম, নির্যাতনের যাতাকলে মানুষকে পিষ্ট করতে সক্ষম হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ তথা সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দুর্বার আন্দোলনে শরীক হয়ে ঈমানী দায়িত্ব পালন করা প্রতিটি মুসলমানের আজ অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব।

তসলিমার বিভ্রান্তির স্বরূপ ও কিছু কথা

বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বিকৃতি সম্পর্কে এদেশের মানুষ কমবেশি অবগত। তার দেশ, সমাজ, ধর্ম, নীতি-নৈতিকতা বিরোধী লেখার কারণে প্রচন্ড গণরোষের শিকার হয়ে বর্তমানে সে দেশছাড়া। তাকে নিয়ে নতুন করে ঘাটাঘাটির অবকাশ আছে বলে মনে করি না। তবে পৃথিবীর তাবৎ নাস্তিকদের মত সন্দেহ, সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী এ লেখিকার অসংখ্য মন্তব্য, প্রশ্ন ও বিকৃত উপস্থাপনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পত্র-পত্রিকা এবং লিখিত বইগুলোর পাতায় পাতায়–যা কোন দিনই মুছে ফেলা সম্ভব নয়। অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের আদালত বিকৃত লেখনির কারণে তাকে এক বছরের কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করেছে। তসলিমার অপরাধ তথা উত্থাপিত বিভ্রান্তিগুলোর যুৎসই জবাব এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তার স্বরূপ উন্মোচিত হওয়ার মত লিখিত দলিল থাকা আবশ্যক বলে মনে করি। এই লেখিকার বিকৃত উত্থান পর্বে "তসলিমার বিকৃতি ও বিভ্রান্তির স্বরূপ" শিরোনামে আমার একটি লেখা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সেটি এই বইয়ের আলোচিত বিষয়গুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী শেষে এখানে গ্রন্থিত হল।

- লেখক

পুরুষ বিদ্বেষী হিসেবে খ্যাত লেখিকা তসলিমা নাসরিন শুধু পুরুষই নয়, নারী অধিকার ও স্বাধীনতার নামে তার লেখনির ছত্রে ছত্রে স্বীকৃত বিবাহ প্রথা, পরিবার, ধর্ম, সংস্কার, নীতি-নৈতিকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধেও চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়িয়েছেন। তার লেখা নিয়ে বহুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, বিতর্কিত লেখিকা হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ লেখিকাকেই আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ও সেদেশের আনন্দবাজার গোষ্ঠি এবং পাশ্চাত্যের একটি গোষ্ঠি

বেছে নিয়েছে। তারা তাকে ভারতের আনন্দ পুরস্কার' হাতে ধরিয়ে দিয়ে এক সময় মহা আনন্দে বগল বাজিয়েছেন। (যদিও ইদানিং সে উৎসাহে অনেকটা ভাটা পড়েছে)।

এ কথা সত্য যে, নারী সমাজ আজ সমাজে নির্যাতিত, নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। নারী সমাজের এ দুরবস্থায় সমাজের বিবেকবান কল্যাণকামী মানুষ যারপর নাই ব্যথিত এবং তার প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট। সমাজের কর্ণদার ব্যক্তিদের অযোগ্যতা, আইনের অপপ্রয়োগ এবং মানুষের মানবিক গুনাবলী ও বিবেকবোধকে ধ্বংস করার সমাজে অবস্থানরত হাজারো মাধ্যমের অবাধ গতি এবং নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণেই আজ পশু স্বভাবা মানুষের দ্রুত বিকাশ সমাজে অব্যাহত গতিতে চলছে। এসব মানুষ নামক পশুদের দ্বারা সমাজে হেন অপকর্ম নেই যা সংঘটিত হচ্ছে না। আর এদের কবলে পড়েই আজ নারী সমাজের এ দুর্গতি। নারী নির্যাতন, নারী অপহরণ, নাবালিকা ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, স্ত্রী হত্যা, স্বামী হত্যা, যৌতুকের বলি, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি অনাকাংখিত কার্যক্রম আজ সমাজে অব্যাহত গতিতে চলছে।

কিন্তু তসলিমা তার লেখনিতে এসব নরপশুদের পাশবিক আচরণকে একচোখাভাবে সকল পুরুষ জাতির উপর চাপিয়ে দিয়ে একদিকে যেমন নারী পুরুষ পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দী হিসাবে দাঁড় করাতে চাচ্ছেন, অন্যদিকে পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত, শান্তি ও কল্যাণময় জীবন-যাপনের জন্য আবশ্যক বিবাহ ও পরিবার প্রথার বিরুদ্ধেও বিষোধগার করে সুকৌশলে নারী সমাজকে অবাধ যৌনাচার ও ব্যাভিচারের পথে ঠেলে দেবার উসকানি দিচ্ছেন। এর পাশাপাশি তিনি নৈতিকতা, সংস্কার, ধর্ম– বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও বিকৃতির আশ্রয় নিয়ে যারপর নাই খড়গহস্ত। প্রশ্ন হচ্ছে, দিক নির্দেশনাহীন এ লেখনির মাধ্যমে সমাজের স্থিতির জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলোর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে লেখিকা কোন পশু সমাজের আবির্ভাব কামনা করছেন? নারী ধর্ষণ করতে শিখুক, ব্যাভিচার করতে অভ্যস্ত হোক (নির্বাচিত কলাম পৃঃ ১০৭) পরামর্শ দিয়ে তিনি সমাজের কি কল্যাণ চান? কি তার আদর্শ, কি তার দর্শন, কোন দর্শনের উপর বিশ্বস্ত হয়ে তিনি বিকৃত কলম হাতে নিয়েছেন, কেনইবা ভারতীয় দাদা বাবুরা তাকে বেছে নিয়েছে এসব প্রশ্নসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার বিভ্রান্তির স্বরূপ উম্মোচিত হওয়া আবশ্যক বলে মনে করি।

আত্মস্বীকৃত নাস্তিক

আসলে তসলিমা এক আত্মস্বীকৃত নাস্তিক। নাস্তিকতায় বিশ্বাসী বলেই সমাজের অন্যায় ও অসংগতিকে পুঁজি করে নারী স্বাধীনতার ছদ্মাবরণে আস্তিকতাবাদের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে সুকৌশলে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ঢেলে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার নাস্তিকদের সেই পুরনো খেলায় তিনিও মেতে উঠেছেন। যে খেলা খেলেছেন পুরাকালের সাদ্দাদ-নমরুদরা, এ কালের সালমান রুশদী, দাউদ হায়দার ও আহম্মদ শরীফরা, তাদেরই যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে তসলিমাও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। পরবর্তী আলোচনা থেকে পাঠকবৃন্দ তার বিভ্রান্তির কৌশল সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাবেন বলে বিশ্বাস। এর আগে নাস্তিক্যবাদী বিশ্বাস ও এর যে বিষবাষ্প তিনি সমাজে ছড়িয়েছেন তার কিছু নমুনা তুলে ধরতে চাই।

আমাদের ৯০ ভাগ মুসলমানের এ দেশে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম হওয়ার কারণে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় পরিচয় বাধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন কোন নজির নেই। কিন্তু তসলিমা নাসরিন তার 'নষ্ট মেয়ে নষ্ট গদ্য' নামক নিবন্ধ সংকলনের ৭৭ পৃষ্ঠায় 'নাস্তিকতাবাদ' নামক নিবন্ধে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম করার প্রতিক্রিয়ায় আক্ষেপ করে বলেছেন, "আমি নিজে কোনও ধর্মে বিশ্বাস করি না কিন্তু একটি বিশেষ ধর্মের ছাপ আমার উপর সরকারীভাবে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মস্থলে, সমাজের সকল জায়গায় আমি মুসলমান বলে চিহ্নিত হচ্ছি।" কিন্তু পাঠকবৃন্দ, তার এই আক্ষেপের জন্য কি রাষ্ট্র ধর্ম দায়ী, না দায়ী তার সৎ সাহসের অভাব? রাষ্ট্র ধর্মতো কোন হিন্দু, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ বা অন্য ধর্মাবলম্বীকে মুসলমান বানায়নি বা মুসলমান পরিচয়ে বাধ্য করেনি, এমনকি কোন নাস্তিকের পরিচয়ের ক্ষেত্রেও নয়। সকলেরই রয়েছে নিজ নিজ ধর্ম পালনসহ ধর্মীয় পরিচয় তুলে ধরার পূর্ণ অধিকার। তবে তসলিমা নাসরিন মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী নব্য নাস্তিক বিধায় তার পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের বিভ্রান্তিতে পড়ার অবকাশ থেকে যায় বৈকি। কিন্তু তিনি নিজেকে নাস্তিক বলে প্রকাশ্য ঘোষণা ও প্রচারমাধ্যমে বিবৃতি দিলেই এ অবকাশ আর থাকে না। কর্মস্থলসহ সব জায়গায় নাস্তিক তসলিমা বলেই তার পরিচয় তুলে ধরা হবে। মুসলিম মিল্লাতে এতটা আকাল লাগেনি যে একজন নাস্তিককেও টেনে ধরে রাখতে হবে।

এছাড়া তার জানা উচিৎ যে, একজন মানুষের স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা বা

না করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে সত্য কিন্তু অপরের বিশ্বাস ও অনুভূতিতে আঘাত করা বা সে বিশ্বাসকে নিয়ে ব্যাঙ্গ করার কোন অধিকার কোথাও নেই– বাংলাদেশের সংবিধানেও তা নিষিদ্ধ কিন্তু তসলিমা তার লেখনির মাধ্যমে অবাধে সে নোংরা এবং বেআইনি কাজটিই করে গেছেন। তিনি তার নির্বাচিত কলামের ৪৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "কারা যেন আমার মাকে বুঝিয়েছে ধর্ম-কর্মে মন দিলে হবে অপার শান্তি লাভ, মা একটি ভুল বিশ্বাস নিয়ে গভীর রাত্তিরে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েন, শেষ রাতে সুর করে দুলতে দুলতে পড়েন "ফাবিয়াইয়ে আলাই-রাব্বুকা।" তার মসজিদ মন্দির নামক কবিতিাটির কয়েক লাইন এ রকম–

গুড়া হয়ে যাক ধর্মের দালান কোঠা
পুড়ে যাক অন্ধ আগুনের মন্দির, মসজিদ, গুরু দুয়ারা, গির্জার ইট
আর সেই ধ্বংস স্তুপের ওপর
সুগন্ধ ছড়িয়ে বড় হোক মনোলোভা ফুলের বাগান
বড় হোক শিশুর স্কুল পাঠাগার।

'নিমন্ত্রন' নামক উপন্যাসের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "এইসব আখেরাত, পুলসেরাত, দোযখ, বেহেস্ত এগুলো আমার বিশ্বাস হয় না। আল্লাহ টাল্লাহ আবার কি ! সব বানানো।"

এসবের পাশাপাশি মুসলিম বিদ্বেষী ও হিন্দু কালচারের ধারক তসলিমা বাঙালী সংস্কৃতির দালালিপনার নামে ৯০% মুসলমানের এই দেশে মাটি ও মানুষের সাথে মিশে যাওয়া কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তথা ইসলামের কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় বিধি-বিধানকে কটাক্ষ করার ধৃষ্টতাও দেখিয়েছেন। তিনি সাপ্তাহিক কাগজ (৯ জুলাই ৯২) পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাতকারে বিভিন্ন প্রশ্নের লিখিত জবাবে বলেছেন, নাস্তিক হলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায়। ঈদের চেয়ে আমাদের সংস্কৃতিতে পয়লা বৈশাখের আবেদন বেশি। নামাজ পড়া বাঙালী সংস্কৃতি নয়। বাঙালী সংস্কৃতির উপর চাপিয়ে দেওয়া ইসলামী সংস্কৃতি এখন এক ধরণের রাজনৈতিক কৌশল। মসজিদের চেয়ে পাবলিক লাইব্রেরী আমাদের বেশি দরকার। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, এক সময় শুনতাম লোকেরা আদাব বলতো এখন 'আসসালামু আলাইকুম' বলে। খোদা হাফেজও এখন আল্লাহ হাফেজ হচ্ছে। বিদায়ের সংগে খোদা হাফেজ বা আল্লা হাফেজের সম্পর্ক কি?

পাঠকবৃন্দ শুধু তাই নয়, এই নাস্তিক মহিলা তার পূর্বে উল্লেখিত নাস্তিকতাবাদ নামক নিবন্ধে বিভিন্ন দেশের নস্তিকদের একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেছেন, "পৃথিবীতে খুব কম করে ধরলেও ১১০ কোটি মানুষ নাস্তিক।

নাস্তিকের কেউ অসৎ মানুষ হিসেবে সমাজে পরিচিত নন। তারা কেউ সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক নন। আস্তিকেরা ঈশ্বর বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তির ভয়ে ভাল কাজ করেন কিন্তু নাস্তিকেরা নিজের বিবেক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকেই সৎ ও মহৎ হয়।"

তিনি আরও লিখেছেন, "মানুষের জ্ঞানবোধ ও যুক্তি বিকশিত হতে হতে মাত্র আড়াই হাজার বছর আগে নাস্তিকতাবোধের আলোকে মানুষ প্রথম আলোকিত করে নিজকে। কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, মিথ্যা বিশ্বাস, যুক্তিহীনতা থেকে মুক্ত হয়ে পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ আজ নাস্তিক্যবাদী।" (পৃঃ ৭৭)

তসলিমার উপরোক্ত আলোচনামতে বুঝা যাচ্ছে যে, সমাজের সব অসৎ লোক আস্তিক। আস্তিকেরা বিবেক ও মানবিক মূল্যবোধ শূণ্য, অযুক্তি নির্ভর, কুসংস্করাচ্ছন্ন জড় পদার্থ। ঠিক যেন নাস্তিক আহমদ শরীফেরই উক্তির প্রতিধ্বনী। আহমদ শরীফ বলেছিলেন, "মূর্খতা ও মুসলমানিত্ব অভিন্নার্থক। যে লোক জ্ঞানী সে নাস্তিক। পৃথিবীতে এমন কোন অপকর্ম নেই যা আস্তিকেরা করেনি। যেকোন আস্তিকের চেয়ে একজন নাস্তিক সব সময়ই ভাল। প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে ইসলাম টিকে আছে ইতর ও অজ্ঞতার মধ্যে। এরা কোন কিছু বুঝার চেষ্টা না করে শুনে শুনে ইসলামকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কয়জন শিক্ষিত লোক ধর্মে বিশ্বাস রাখে।" (২২ অক্টোবর-৯২, দৈনিক ইনকিলাব ও অন্যান্য পত্রিকা)।

পাঠকবৃন্দ, এবার দেখুন সব শিয়ালেরই এক 'রা'। এদের উক্তি অনুযায়ী পৃথিবীতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপুরুষ ও মহামানবদেরকেও অজ্ঞ, মুর্খ, অসৎ (নাউজুবিল্লাহ মিনজালিক) হিসাবে ধরে নিতে হয়। আস্তিকতায় বিশ্বাসী পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানী, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, চিকিৎসক, আইনজ্ঞ, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক তথা পন্ডিত ব্যক্তিরা কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, মিথ্যাবিশ্বাস ও যুক্তিহীনতায় ডুবে আছে বলে প্রতিয়মান হয়। ধৃষ্টতা আর কাকে বলে।

অথচ বাস্তব সত্য হচ্ছে, এসব নাস্তিকেরাই পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির মূল কারণ। এরা নৈতিক জ্ঞানবোধশূণ্য বলে উচিত-অনুচিত সকল কর্মকেই যৌক্তিক বলে মনে করে। পরবর্তী বিষয়ভিত্তিক আলোচনা থেকে এদের সাধুতাবোধের নমুনা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তার আগে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞ ডাক্তার তসলিমা নাসরিনের অভিমত (ধর্ম বিশ্বাসের বিকল্প হতে পারে বিজ্ঞানে বিশ্বাস) ও আক্ষেপের (বিজ্ঞান নিয়ে যাদের দিনভর কাজকাম, তারাই যদি কপালে সেজদা ঠোকার দাগ করে ফেলে সেই লজ্জা বলে রাখি কোথায়! মেডিকেল কলেজ বা হাসপাতালের মসজিদগুলোয় নামাজের জন্য যত ভীড় হয়, আমার মনে হয় তত বিড় আর অন্য

কলেজ বিশ্বাবিদ্যালয়ের মসজিদে হয় না।" অপরপক্ষ, পৃষ্ঠা-১৯) বিপরীতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অভিমত বা রায় কি, সে সম্পর্কে তাদের বক্তব্যের কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরতে চাই।

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী এ্যালবার্ট আইনেষ্টাইনের ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে চূড়ান্ত অভিমত হলো, "Science without religion is lame and religion without science is blind"

বিশ্বের অন্যতম প্রধাণ পদার্থ বিজ্ঞানবিদ লর্ড কেলভীন বলেছেন, "আপনি যদি খুব গভীরভাবে চিন্তা করেন বিজ্ঞান আপনাকে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করবে।"

ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক রোমানেস তাঁর স্বল্পকাল আগে স্বীকার করে গেছেন যে, তার সমুদয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারা মূলতঃ ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি স্বীকার করেছেন, মহাবিশ্বকে কোনক্রমেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার না করে বোঝানো যায় না।"

প্রখ্যাত প্রাণী ও কীট-তত্ত্ববিদ, সানফ্রানসিসকো বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, ক্যালিফোর্নিয়া একাডেমী অব সায়েন্সের স্টাফ-কীট পতংগের এসোসিয়েট কিউরেটর এডওয়ার্ড লুথার কেসেল বলেছেন, "সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার দিকে আমাদের মনকে আকর্ষণ করবে বেশী।"

আমেরিকার বিখ্যাত প্রাণ পদার্থবিজ্ঞানবিদ, পলফ্ল্যারেন্স ইবারগোল্ড বলেছেন, "আমরা একটি বিষয় নিশ্চয়ই উপলব্ধি করি যে, মানুষ ও এই মহাবিশ্ব সম্পূর্ণ শূণ্যতা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়নি। নিশ্চয়ই এসবের একটা আরম্ভ আছে এবং তজ্জন্য একজন আরম্ভকর্তাও রয়েছেন। আমরা আরও উপলব্ধি করি যে বিশ্বে এই চমৎকার ও জটিল প্রাকৃতিক আইনাবলী কখনও মানুষের নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয় না এবং প্রাণের যে রহস্য তারও একটা উৎস নিশ্চয়ই আছে, মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত এক নির্দেশ শক্তি একটি পবিত্র প্রথমারম্ভ এবং একটি পবিত্র নির্দেশ।"

প্রখ্যাত আমেরিকান শরীরতত্ত্ববিদ, বিপাক ও সঞ্চালন বিশেষজ্ঞ, মারলিন বুকস ক্রীডার বলেছেন, "সাধারণ মানুষ হিসাবে এবং বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও গবেষণায় জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তি হিসাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার মনে আদৌ সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।"

আরও একজন প্রখ্যাত মার্কিন পদার্থ বিজ্ঞানবিদ ও রসায়ন শাস্ত্রজ্ঞ ডঃ অসকার লিও ব্রয়ার বলেছেন, "নাস্তিকতার অর্থ হচ্ছে দ্বন্দ্ব আর যুদ্ধ। বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমি এর কোনটিই চাইনা। থিওরী হিসাবে আমি নাস্তিকতাকে অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত বলে মনে করি। বাস্তব দিক থেকে আমার মনে ইহা মারাত্মক ক্ষতিকর।"

মিচিগান ষ্টেট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক, প্রখ্যাত প্রকৃতি বিজ্ঞানী ডঃ ইরভিং উইলিয়াম নবলচ বলেছেন, "আমি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি। আল্লাহ্‌কে যে জন্যে বিশ্বাস করি তার কারণ হচ্ছে আমি মনে করি না সর্বপ্রথম ইলেকট্রোন বা প্রোটণ অথবা প্রথম পরমাণু বা প্রথম অ্যানিমো-এসিড, অথবা প্রথম প্রোটোপ্লাজম অথবা বীজ, অথবা সর্বপ্রথম মস্তিস্কটির জন্মের জন্যে কেবলমাত্র দৈব দায়ী। আমি আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি তার কারণ আমার কাছে এই সব কিছুর মূলে আল্লাহ্‌র পবিত্র অস্তিত্বই একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা হতে পারে।"

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব বিদ্যার অধ্যাপক রংক্লিন বলেছেন, "পদার্থের সংযোজনের ঘটনাক্রমে হঠাৎ জীবন স্পন্দন শুরু হবার সম্ভাবনা ঠিক ততটুকুই, যতটুকু সম্ভাবনা আছে একটি মুদ্রণালয়ে হঠাৎ বিস্ফোরণ হবার ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ অভিধান সংকলিত, সম্পাদিত ও মুদ্রিত হয়ে বের হয়ে আসার।"

বিখ্যাত মার্কিন চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ ও প্রাবন্ধিক অলিভার ওয়েনডেল বলেছিলেন যে, "জ্ঞান যতই বাড়তে থাকে বিজ্ঞান ততই ধর্মকে ভ্রুকুটি করা থেকে বিরত হয়। বিজ্ঞানকে উপযুক্ততার সংগে বুঝতে পারলে দেখা যাবে, সর্বশক্তিমানে বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারে বিজ্ঞানই অধিক থেকে অধিকতর সম্ভাবনাময় করে তোলে।" (চল্লিশজন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব নামক বই থেকে)

এ ধরণের আরও অসংখ্য বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব তথা অস্তিকতাবাদের স্বপক্ষে তাঁদের দ্ব্যর্থহীন অভিমত প্রকাশ করেছেন। এসব বিজ্ঞানীদের অভিমতের পাশাপাশি আমাদের তসলিমাদের মত লেখিকাদের অভিমত এবং চটুল উক্তি তাদের হাতুড়ে বিজ্ঞানী এবং হাতুড়ে ডাক্তারের পরিচয়টাই স্পষ্ট করে তোলে। প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ও রাজনীতিবিধ ফান্সিস বেকন বলেছিলেন, "সামান্য দর্শনজ্ঞান মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায় আর গভীর দর্শনজ্ঞান তাকে ধর্মের পথে টেনে আনে।" –পৃথিবীর তাবৎ নাস্তিক এবং আমাদের আলোচ্য নব্য নাস্তিক তসলিমা নাসরিনরাও আসলে বেকনেরই উক্তির প্রতিবিম্ব। তসলিমা নাসরিনের নাস্তিকতার স্বপক্ষে হালকা উক্তি ও জ্ঞানের বহর

দেখে যে কনের উক্তির যৌক্তিকতাই ফুটে উঠে। তসলিমাকে বলবো, শূণ্য কলসির আওয়াজ বেশী আর দুষিত পানিতে ভর্তি হলে তা হয় অখাদ্য। সুতরাং বিশুদ্ধ পানির চর্চা ও গবেষণায় মনোনিবেশ করুন।

অবাধ যৌনাচার ও ব্যাভিচারের উসকানি

নাস্তিকতাবাদী দর্শনমতে অবাধ যৌনতায় বিশ্বাসী তসলিমা নাসরিন এ সর্বনাশা বিষ আমাদের সমাজেও ছড়িয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছেন। তিনি বিবাহ ও পারিবারিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়মনীতি, স্বাভাবিক ক্রুটি বিচ্যুতি এবং অন্যান্য অপ্রাসংগিক বিষয়কে উপজীব্য করে চাতুর্যের সাথে বিকৃত পরিবেশনা এবং সমাজের লম্পট পুরুষদের লাম্পট্যপনাকে নির্বিচারে সকল পুরুষ জাতির উপর চাপিয়ে দিয়ে বিবাহ ও পরিবার প্রথার বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষ ঢেলে নারী সমাজকে চরম উসকানির মুখে অবাধ যৌনাচার ও ভাংগনের পথে ঠেলে দেবার এক অশুব খেলা জুড়ে দিয়েছেন।

কবি-সাহিত্যিক বা লেখকরা সমাজের চিন্তাশীল ও বিবেকবান ব্যক্তিত্ব। তাঁদের বিবেক নিসৃত লেখা মানুষকে উজ্জীবিত করে, সত্য-সুন্দর ও কল্যাণের পথ নির্দিষ্ট করে এবং তাদেরই রয়েছে লেখার পূর্ণ স্বাধীনতা। কিন্তু লেখকের স্বাধীনতার নামে কোন বদ্ধ উম্মাদের উন্মাদনার স্বাধীনতা স্বীকৃত হতে পারে না নিশ্চয়ই। যে লেখা সুস্থ্য বা অসুস্থ্য মানুষ ও সমাজকে আরও অসুস্থ্য করে, বিপথে ঠেলে দেয় এর কোন স্বাধীনতা থাকতে পারে না– থাকা উচিত নয়। যেমন স্বাধীনতা নেই স্বামী-স্ত্রীর মিলনের বৈধ অধিকার থাকা সত্ত্বেও রাজপথে নেমে তার চর্চা করার। কিন্তু পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ লেখিকা নামের এই উন্মাদিনি তসলিমা নাসরিন আমাদের সমাজে দাবানলে ঘি ঢালার কাজটিই করে গেছেন অবাধে। তার লেখাজোখা ও প্রকাশিত বইপত্রগুলো বিকৃতি ও নোংরামিতে পরিপূর্ণ। অবাধ যৌনাচার ও ব্যাভিচারের উস্কানিই এগুলোতে মুখ্যতা লাভ করেছে।

তসলিমা তার 'নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য' নামক নিবন্ধ সংকলনের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "সতীত্বের সংগে সততার কোন সম্পর্ক নেই, এই সতীত্বের অর্থ যৌনাংগকে অকেজো রাখা।" একই বইয়ের ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "সামাজিক বিবাহ বন্ধনের সংগে নারীর সন্তানের যোগসূত্র থাকতেই হবে এ কোনও সভ্য মতবাদ নয়। নারী যদি ইচ্ছে করে তার গর্ভে ফুল ফুটুক, তবে তার এবং তার গর্ভের অধিকার আছে ফুল ফোটাবার। ভদ্র লোকেরা বিবাহের দলিল চাইবে দেখতে, সামাজিক চৌকিদারেরা নারীর চরিত্রে কালি ছুঁড়বার আয়োজন করবে,

তারা তাদের বানানো সতীত্বের সংজ্ঞা এনে দাঁড় করাবে সামনে এতে নারী এবং তার সন্তানের কিছুই যায় আসে না। নারী এবং তার সন্তানকে সমাজের ভদ্র লোকেরা নর্দমায় ছুড়বে, গাল দেবে, বেত্রাঘাত করবে, জেলে ভরবে– এতে নারী এবং তার সন্তানের পবিত্রতা সামান্যও ম্লান হবে না।"

তসলিমা নাসরিনের উপরোক্ত বক্তব্য নিয়ে কোন মন্তব্য করতে চাইনা। পাঠকবৃন্দই বিচার করে দেখুন এ নাস্তিক মহিলা কি চায়, নারী সমাজ এবং এ সমাজকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়। এসব উসকানি শুধু বই পুস্তকেই নয়, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও অবাধে দিয়ে গেছেন। আর এক শ্রেণীর পত্রিকা এসব বিকৃতিকে স্থান দিয়েছে স্বউল্লাসে।

সাপ্তাহিক 'যায়যায়দিন' পত্রিকার ১৩ অক্টোবর' ৯২ সংখ্যায় 'অবদমন' নামক একটি নিবন্ধে তসলিমা একটি ঘটনা বিবৃত করেছেন। সম্ভবত আদর্শ প্রচারের প্রয়োজনে তার উর্বর মস্তিস্কেরই সাজানো।) "পাঁচতারা হোটেলে 'লেডিস টয়লেট' পরিস্কার করেন এরকম এক ভদ্র মহিলার সাথে লেখিকার কথোপকথন হয়। মহিলা তার পংগু স্বামী এবং তিন ছেলে-মেয়ের সংসার নিজের আয়ে চালাচ্ছেন। যৌন জীবনে অক্ষম স্বামীকে নিয়ে তিনি সাত বছর সংসার করছেন। মহিলার নিজের এ অবস্থা হলে তার স্বামী বিয়ে না করা এবং যৌন অবদমন করতেন কিনা লেখিকার এ প্রশ্নের জবাবে মহিলার জবাব– অসম্ভব। এরপর মহিলাকে লেখিকা উপদেশ দিলেন, "ঠিক আছে বিয়ে না করলেন, শরীরকে কষ্ট দিচ্ছেন কেন? প্রয়োজনে একে তৃপ্ত করছেন না কেন?" –ভদ্র মহিলা জিহ্বায় কামড় দিলেন, বললেন, ছিঃ ছিঃ তা কি করে হয়?"

ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত রূপ মোটামুটি এরকম। আলোচ্য ঘটনামতে তসলিমা নাসরিনের ধারণা (অথবা যৌন উসকানি দানের একটি কৌশল) সকল পুরুষই একই ধারার, কিন্তু পংগু বা অক্ষম স্ত্রী নিয়ে ঘর সংসার করছে এমন উদাহরণ কি সমাজে নেই? আর পংগু, অসুস্থ্য বা সুস্থ্য স্বামী-সন্তান রেখে ঘর সংসার ছেড়েছে এরকম উদাহরণও কি সমাজে কম?

আসলে ঘর-সংসার টিকে থাকে পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা, নৈতিকতাবোধ ও বিবেকবোধের উপর। যেখানে এসবের ঘাটতি রয়েছে সেখানেই ভীত্ নড়বড়ে হয়ে উঠে। ভালবাসার ভীতকে দৈহিক চাহিদা উপড়ে ফেলতে পারে না। স্বামীর সংগে যৌন সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও যে মহিলা সাত বছর ধরে নীরবে কোন অভিযোগ ছাড়াই স্বামী ও সন্তানের সেবা করে যাচ্ছেন সে রকম একজন মহিলাকে

তাসলিমা তার নিজস্ব দৃষ্টিভংগী দিয়ে বিচার করে একটি অসহায় পরিবারকে পথে বসাবার এবং তার আজন্ম লালিত সততাকে জলাঞ্জলী দেবার পরামর্শ দিয়েছেন। তসলিমা কি সব মানুষকে তার মতই ভাবছেন? তার মত ভোগবাদীদের দ্বারা সাত বছরতো দূরে থাকুক, সাত দিনও টিকার কথা নয়, এরকম উদাহরণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজে শত শত রয়েছে।

উপন্যাসগুলোও তার একই বিকৃতিতে ভরা। "শোধ' নামক উপন্যাসটিতে নায়কের সাথে নায়িকার দীর্ঘদিন ছুটিয়ে প্রেম, প্রেমের পরিণতিতে বিয়ে এবং বিয়ের দেড়মাস পর পেটে সন্তান আসা এ স্বাভাবিক বিষয়টিকে তসলিমা একটি বিকৃত উদ্দেশ্যে স্বামীর মনে অবাস্তব সন্দেহের বীজ ঢুকিয়ে (দেড় মাসে আবার সন্তান আসে নাকী?) এবরশনের মাধ্যমে "স্ত্রীর পেটের সন্তান নষ্ট করানো এবং পরবর্তীতে স্বামীর এই আচরণের প্রতিশোধ সরূপ স্ত্রীকে গোপনে অপর লম্পট পুরুষের শয্যাসংগী করে একটি অবৈধ সন্তান পেটে ধারণ ও তার জন্ম দিয়ে স্বামীর অবাস্তব সন্দেহের শোধ নিয়েছেন। পাঠকবৃন্দ, উপন্যাসের নামে এই বিকৃত ঘটনার জন্ম দিয়ে তসলিমা আজকের নারী সমাজ ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে শিক্ষা দিলেন এভাবেই প্রতিশোধ নিতে এবং সমাজে তার লালিত আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখতে।

'অপরপক্ষ' নামক চিঠির উত্তর ও প্রতিউত্তরের আকারে লিখিত উপন্যাসেও লেখিকা একই বিকৃতি তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের মূল চরিত্র যমুনার মাধ্যমে বোন নাম্নী ভাবশীর্ষ নুপুরকে তার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে জ্ঞান বিতরণ এবং আদর্শের চর্চা ও ব্যাখ্যা করেছেন। আদর্শতো তার একটিই আর সেটি হলো 'ফ্রিডম অব সেক্স' আলোচ্য উপন্যাসেও যমুনা নাম্নী লেখিকা নুপুরের এক প্রশ্নের জবাবে স্বীকার করেছেন যে, তিনি ফ্রিডম অব সেক্সে বিশ্বাসী। লম্পট পুরুষদের লাম্পট্যপনার অজুহাতে নারী সমাজকেও একই অসভ্যপনার পথে ঠেলে দেবার প্রচেষ্টাই এতে মুখ্য হয়ে ফুটে উঠেছে।

আলোচ্য উপন্যাসের ৩৬ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র যমুনাকে দিয়ে লেখিকা বলেছেন, "শরীরের শুচিতা নিয়ে বড় বেশী ভাবতাম, এখন এসব খুব তুচ্ছ মনে হয়। হুমায়ুন (স্বামী) যখন আমার সংগে ঘনিষ্ট হয়, আমি ওর শরীরে অন্য মেয়ে মানুষের গন্ধ পাই। এ হতেই পারে, আমি ওকে আটকে রাখব কেন, আমার শরীর কি কোনো খাঁচা যে ওকে সেই খাঁচায় বন্ধি রাখতে হবে। একইভাবে আমিইবা কেন বন্দি হবো।"

৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "সতীত্বের প্রচলিত ধারণায় আমি বিন্দুমাত্র বিশ্বাসী নই। কারণ এটি খুব অশালীনভাবে মেয়েদের উপর আরোপিত একটি সংস্কার। হুমায়ুন ছাড়া আর কোনো পুরুষের সংগে আমার শারিরীক সম্পর্ক নেই, কিন্তু আর কারো সংগে এই সম্পর্ক যদি আমার ঘটে আমি কি অসতী বলবো নিজেকে? নিশ্চয়ই নয়। কারণ আমি একশভাগ সৎ থেকে অন্য পুরুষের সংগে যদি সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি তাতে ক্ষতি হয় না কারো। না আমার না হুমায়ুনের।"

পাঠকবৃন্দ, আমাদের বিকৃত মস্তিস্ক লেখিকা একশত ভাগ সৎ থেকে' বলতে কি বুঝাতে চান বোধগম্য নয়। তবে তিনি নায়িকা যমুনাকে কিন্তু অবশেষে আর সম্পর্কহীন রাখেননি। তার ভাষায় একশভাগ সৎ রেখেই স্বামীর অনুপস্থিতিতে আরেক লম্পট পুরুষের শয্যাসংগী করে ছেড়েছেন। পরিণতিতে চার মাসের অবৈধ সন্তান পেটে ধারণ এবং ধারণকৃত পাপের স্বপক্ষে পুরুষের লাম্পট্যপনার অজুহাত তুলে যৌক্তিকতা দানের কসরত শেষে বলেছেন, "এই যে চার মাসের বাচ্চা আমার পেটে, এ বাচ্চা আমার! আমি একে জন্ম দেবো, অমি একে পরিচয় দেব।" '(পৃষ্ঠাঃ ৬১)

আশ্চর্য হতে হয় যে, 'এইডস' এর জীবানুর ন্যায় সংক্রামিত এসব নর্দমার আবর্জনাও সাহিত্যের নামে আমাদের বাজারে ঢোকার অনুমতি পেয়েছে। এমনিতেই সমাজ আজ যৌন অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় চেয়ে গেছে। অপহরণ, ধর্ষণ, যৌন হত্যা, যৌন-কেলেংকারী মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ছে। তার উপর যুবক-যুবতী চরিত্র নস্যাতের এই নির্লজ্জ উস্কানী, এসব দেখার কি কোন কর্তৃপক্ষ এদেশে আছে বলে মনে হয়?

তসলিমা তার আলোচ্য উপন্যাস এবং অন্যান্য লেখায়ও বলেছেন যে, অসতী বেশ্যা, নষ্টা ইত্যাদি শব্দগুলোর নাকী প্রতিশব্দ নেই, অর্থাৎ পুরুষদের ক্ষেত্রে এ ধরণের অপমানকর শব্দ প্রয়োগ হয় না। অথচ কে না জানে দুশ্চরিত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে অসৎ, লম্পট লোচ্ছা, বদমায়েশ ইত্যাদি শব্দগুলোর প্রয়োগ এবং এসব শব্দের অপমানের ধার নারীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগিত শব্দের চেয়ে মোটেই কম নয়। পতিতা গমন বা অন্য নারীতে আসক্ত চিহ্নিত দুশ্চরিত্র পুরুষকে সমাজে কেউ ভাল চোখে দেখে বা বাহবা দেয় এরকম কি দেখতে পাওয়া যায়? ভ্রষ্ট-ভ্রষ্টই, সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক। এরা সমাজের কলংক। কিন্তু কারো ভ্রষ্টতা বা লাম্পট্যপনার অজুহাতে অপরকেও সে কাজে উৎসাহিত করণ, ধর্ষণের পরিবর্তে ধর্ষণ বা ব্যাভিচারের উসকানি দান, একি কোনো বিবেকবান মানুষ, কোনো

সাহিত্যিক বা কোনো লেখক-লেখিকার কর্ম হতে পারে? কিন্তু লেখিকা নামের কলংক, যৌন উন্মাদিনী, নাস্তিক তসলিমা আমাদের সমাজে অবাধে সে কাজটিই করেছেন। তার আর একটি বিকৃতির নমুনা তুলে ধরেই এ প্রসংগ শেষ করতে চাই।

সাপ্তাহিক 'যায়যায়দিন' পত্রিকার ১৬ই মার্চ, ৯২ এর ঈদ সংখ্যায় 'দিন যায়' নামের একটি গল্প তসলিমা লিখেছেন। ঐ গল্পেও তিনি তার গৎবাধা নিয়মে স্বামীর সাথে স্ত্রীর ভিভোর্স দেখিয়ে অবশেষে চাকুরীজীবি স্ত্রী তার একমাত্র মেয়ে দোপাটিকে নিয়ে আলাদা জীবন-যাপন শুরু করেন। এ গল্পেও লেখিকা তালাকপ্রাপ্তা নায়িকার মাধ্যমে তার লালিত নোংরামিপনাকে নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

"মানুষের জীবন আসলে এক উত্তাল সমুদ্র, ঢেউ কোথাও থেমে থাকে না, গতিময় এবং প্রাণবান জীবন মানুষের। একটি যুবকের সংগে এর মধ্যে পরিচয় হয়, নতুন অফিসে আমার সহকর্মী। বয়স আমার চেয়ে দুবছরের ছোট হবে। সেই যুবকের সংগে বন্ধুত্ব হতে হতে আমার এমন হয় যে, তার সংগ আমার খুব বেশী ভাললাগে। বাড়ীতেও সে আসে। একদিন সে আমার দু'কাধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কী মমতা, আমাকে ভালবাস?

আমি চোখ বুঁজে উত্তর দিলাম– হ্যাঁ।

তারপর দুজনেই আমরা আমাদের মন ও শরীরের প্রয়োজনে বিছানায় যাই। এ সম্পর্কের জন্য আমার কোনও লজ্জা বা সঙ্কোচ হয় না। যুবকের নাম কায়েস। কায়েস আমাকে ভালবাসে, আমিও কায়েসকে। কায়েসের বউ বাচ্চা আছে, ওদের প্রতি সে যথেষ্ট আন্তরিক। তার আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করে। কায়েসের সংগে সম্পর্কের ব্যাপারে দোপাটিকে আমি বলেছি ও আমার বন্ধু। ওকে আমার স্বামী করব না কখনও। তবে বন্ধুত্বের সম্পর্কটি কতদূর যায় না যায় সে একেবারেই আমার ব্যক্তিগত।

দোপাটি মাথা নেড়ে হেসেছে। অর্থাৎ মা তোমাকে আমি ভালবাসি। তুমি তোমার যা ভাল লাগে কর।'

পাঠকবৃন্দ এখানেও তার যৌন বিকৃতি ও যৌন অরাজকতাকে উসকে দেয়ার নমুনা লক্ষ করুন। তাছাড়া এ মহিলা তার বিভিন্ন লেখায় লম্পট পুরুষরা ঘরে বউ রেখে ভিন্ন নারী গমন করে বলে খেদোক্তি প্রকাশ করেছেন। এই তিনিই আবার এখানে ভিন্ন কথা বলছেন, অর্থাৎ লম্পট কায়েসের মাঝে বউ-বাচ্চার প্রতি যথেষ্ট

আন্তরিকতা আবিস্কার করে ফেলেছেন, আর তা দেখে মমতা নামের চরিত্রকে দিয়ে মুগ্ধতার ঢেকুরও চেড়েছেন। স্রষ্টা আর কাকে বলে!

জরায়ুর স্বাধীনতা ও জারজ সন্তানের স্বীকৃতি দাবি

তসলিমার 'নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য' নামক নিবন্ধ সংকলনের ৪০ ও ৪২ পৃষ্ঠায় 'সকল সন্তানই বৈধ' এবং 'জারজ শব্দের বিলুপ্তি চাই' শিরোনামে দু'টি নিবন্ধ রয়েছে। ঐ নিবন্ধগুলোতে লেখিকা প্রাচীণ রামায়ন ও মহাভারতে বর্ণিত এবং আজকের বিশ্বে হাতে গোনা কিছু জারজ সন্তানের বীরত্ব ও কীর্তি তুলে ধরে অবশেষে মন্তব্য করেন, "অজারজ ও জারজ সন্তানে তবে পার্থক্য কি? ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষেরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে স্বয়ং ঈশ্বরই অজারজ ও জারজে কোন পার্থক্য করেনি। পার্থক্য করেছে আসলে পৃথিবীর মানুষেরা।"

৪২ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "কুমারী নারীর গর্ভে সন্তান ধারণ বৈধ নয়, পুরুষ তৈরী এই নিয়মের শৃঙ্খলে বন্দি প্রতিটি নারীর জরায়ু। নারীর যেমন কোনও স্বাধীনতা নেই, নারীর জরায়ুরও নেই।" একই নিবন্ধের ৪৩ পৃষ্ঠায় "পৃথিবীতে অনেক অসভ্য শব্দের জন্ম হয়েছে এর মধ্যে 'জারজ' শব্দটি অন্যতম একটি। মানুষের সকল জন্মই বৈধ। কোনও সন্তানই অবৈধ নয়– সব সন্তানই মানব সন্তান। জারজ ও অজারজ সন্তানে কোন পার্থক্য নেই বলে তিনি জারজ শব্দটির বিলুপ্তি দাবি করেছেন।

এছাড়া তিনি তার নির্বাচিত কলাম নামক বইয়ের ১৫৪ পৃষ্ঠায় "নারী তার শরীরে জরায়ু ধারণ করে, কিন্তু জরায়ুর স্বাধীনতা ধারণ করেনা। জরায়ুতে সন্তান বহন করবার এবং না করবার স্বাধীনতা নারীর নেই বলে আক্ষেপ করে অবশেষে বলেছেন, জরায়ুতে সন্তান ধারণের নানা রকম শর্ত পুরুষেরা আরোপ করেছে। যেমন বিবাহ (স্বামী-সংগ ছাড়া নারী সন্তানবর্তী হতে পারে না) বংশ, মাতৃত্ব। শর্ত থাকবার অর্থ জরায়ু যার, জরায়ুর ওপর তার কোনও ইচ্ছে অনিচ্ছের অধিকার চলবে না।"

পাঠকবৃন্দ, তসলিমার উপরোক্ত বক্তব্য নিয়েও কোনো মন্তব্য করতে চাই না। আপনারাই বিচার করে দেখুন এ নাস্তিক লেখিকা এ সমাজের জন্য কি অভিশাপ কামনা করছেন এবং তা উসকে দিতে চাইছেন। তবে তার স্ব-বিরোধীতা দেখে আশ্চর্য হই যে, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হলেও জারজ সন্তানের সাফাই গাইতে এখানে ঈশ্বরকে টেনে এনেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, কোনও ধর্মেই কি ঈশ্বর (গড বা আল্লাহ যা-ই বলিনা কেন) ব্যাভিচার বা 'জারজ' জন্মের অনুমোদন দিয়েছে?

লম্পট মানুষেরা ঈশ্বরের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই পাপের পথে পা বাড়াচ্ছে। ঈশ্বরের বিধি-নিষেধ লংঘন করলে অপমানিত, অপধস্ত ও কলংকিত হতে হয়, এটাই ঐশ্বরিক নিয়ম, এভাবেই তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন। আর ফ্রিডম অব সেক্সে বিশ্বাসী একজন নাস্তিকের চোখে জারজ ও অজারজে কোনো পার্থক্য না থাকলেও জারজের পক্ষে সাফাই গাইতে তিনি যে ঈশ্বরকে টেনে এনেছেন সে ঈশ্বরই এই দু'য়ের মাঝে সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। একটি হলো ঈশ্বর নিষিদ্ধ, সমাজ অস্বীকৃত পাপ-পংকিলতা ও যৌন অরাজকতার পথে সমাজের স্থিতি ও শান্তি নস্যাতের দায়িত্বহীন ভোগের ফসল আর অন্যটি হলো ঈশ্বর স্বীকৃত, সমাজ অনুমোদিত, সমাজের সুস্থ্যতা ও যৌন শৃংঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বসর্বস্ব বৈধতার ফসল। নাস্তিকের চোখে এই দুইয়ে কোন প্রভেদ না থাকলেও আস্তিক ও সমাজের কল্যাণকামী মানুষের চোখে পাহাড়সম বিধে।

লেখিকা তার নিবন্ধে আরও বলেছেন যে, জারজ জন্মের দায় শুধু নারীকেই ভোগ করতে হয়, পুরুষকে দায় ভোগ করতে হয় না, লজ্জা পোহাতে হয় না।'

তার বক্তব্যে আংশিক সততা রয়েছে, কারণ নারীকেই এ পাপের ফসল ধারণ, দীর্ঘ সময় বহন ও তাকেই জন্ম দিতে হয় বিধায় নিন্দা ও ঘৃণার ভাগ নারীর ক্ষেত্রেই বেশী, কিন্তু চিহ্নিত পুরুষকে মোটেই পোহাতে হয় না একথা ঠিক নয়। নারীর তুলনায় কম হলেও ভ্রষ্ট পুরুষের ক্ষেত্রেও কম যায় না।

পাঠকবৃন্দ আশ্চর্য হবেন যে, পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নারীমাতা 'মেরি' বা বিবি মরিয়ম, যার ঘরে জন্ম নিয়েছে আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতে হযরত ঈশা (আঃ) এর মত নবী যাদের পবিত্রতা নিয়ে কোনও সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কোরআনেই যাদের পবিত্রতার কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। সেই পবিত্র মাতা সম্পর্কেও (লেখিকার মন্তব্য– জোসেফের সংগে মেরীর শারিরীক সম্পর্ক হয়ত হয়নি কিন্তু অন্য পুরুষের সংগে হয়েছিল, একথা চার্চের অনেকেই আজকাল বিশ্বাস করেন। ক্যাথলিক ব্র্যাংক হিনিমেন বলেছেন, যীশু হচ্ছে 'A monstreus product of meuretic sexual fantasy' পৃঃ ৪২) চার্চের অনেকেই শব্দের ছদ্মাবরণে এবং জনৈক ক্যাথলিক নামের নাস্তিকের (যেমন মুসলিম নামের নাস্তিক তসলিমা) রেফারেন্সহীন উদ্ধৃতি তুলে ধরে কটাক্ষ এবং সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করার মত দুঃসাহসও আমাদের এই কুখ্যাত লেখিকা দেখিয়েছেন। 'পাপাচার বা কুমারী নারীর গর্ভে সন্তান ধারণ বৈধ নয়' আল্লাহ্ এবং পবিত্র কোরআনে পাকের এই নিষেধাজ্ঞাকে পুরুষের তৈরী নিয়ম শৃঙ্খল বলা,

নারীর জরায়ুর স্বাধীনতা নেই বলে আক্ষেপ করা, সব সন্তানই বৈধ বলে জারজ সন্তানের বৈধতা দাবি, 'জারজ' শব্দের বিলুপ্তি দাবি, এগুলো এ সমাজে তার জন্য দুঃসাহসই বটে। আর এ দুঃসাহসের কাজটিই তসলিমা করে গেছেন অবাধে।

বেহায়াপনার উসকানি

তসলিমা অবাধ যৌনাচার ও ব্যাভিচারের পাপাপাশি নারী সমাজকে নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনারও উসকানি দিয়েছেন সমানতালে। হয়তো অবাধ যৌনতার পথকে স্বাভাবিকতা দান ও সঙ্কোচমুক্ত করাই এর উদ্দেশ্য। এ মহিলা তার নির্বাচিত কলামের ২১ পৃষ্ঠায় আমাদের দেশের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সম্মানিতা স্ত্রী বিলেতে বারো বছর বসবাস করে দেশে আসার পর পারিবারিক আলাপচারিতা শেষে তার কোন এক দূরআত্মীয়ের বাড়িয়ে দেয়া হাতে করমর্দন না করায় খুব নাখোশ হয়েছেন। তার এই নাখোশ বোধহয় এই কারণে যে, বারো বছর বিলেতের মত দেশে বসবাস করেও তথাকথিত আধুনিকা ও প্রগতিশীল হতে এবং পুরুষের সামনে হাস্যেলাস্যে পেলবকর পল্লব বাড়িয়ে দিতে পারেনি বলে। একই বইয়ের ৮৪ পৃষ্ঠায় লেখিকা তার তেরো বছরের ভাই গরম লাগছে বলে এক উঠোন মানুষের সামনে গায়ের জামা খুলে ফেলেছিল, কিন্তু তার চেয়ে অধিক গরমে কাতর হয়েও সমবয়সী বোন তিনি অবলীলায় গায়ের জামা খুলতে পারেননি বলে আক্ষেপ করেছেন, আক্ষেপ করেছেন খোলা হাওয়ায় গা খুলে স্নান করতে পারেননি বলে।

পাঠকবৃন্দ, তিনি আমাদের সমাজে যা পারেননি তা তার সতীর্থ ও স্বজাতীয়রা কানাডা দেশে পেরেছেন বলে নিশ্চয় গর্বে ফুলে, ফেঁপে উঠেছিলেন, কিন্তু বাদ সেধেচে সে দেশের সরকারের আইন। আর তাই আমাদের লেখিকাও কানাডা সরকারের ঐ আইনের বিরুদ্ধে হুংকার ছেড়েছেন।

ঘটনাটি হলো, কানাডায় স্বাধীনতা ও প্রগতির ধ্বজাদারী এক শ্রেণীর বেহায়া নারীরা শরীরের উর্ধ্বাংগ খোলা রেখেই রাজপথে চলাচল করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। তাদের এই অশ্লীল চলা-ফেরায় সমাজের শ্লীল ও সভ্য মানুষদের পক্ষ থেকে আপত্তি আসে। এ আপত্তি ও সমালোচনার মুখে সরকার বাধ্য হয়ে আইন পাস করেন যে, নারীরা উর্ধ্বাংগ অনাবৃত রেখে ঘরের বাইরে বের হতে পারবে না। কিন্তু সরকারের এই আইনের বিরুদ্ধে ওসব বেহায়া নারীরা আরো বেপরোয়া এবং সংঘবদ্ধ হয়ে উর্ধ্বাশ অনাবৃত করেই রাজপথে প্রতিবাদ মিছিল বের করে। তাদের এই মানসিক বিকৃতি এবং নির্লজ্জতার ধরণ দেখে সভ্য ও শ্লীল মানুষেরা ঘৃণা ও

থুথু দিয়েছে আর অসভ্য, বর্বর, পশুস্বভাবা যৌন উম্মাদেরা বাহবা দিয়েছে প্রশংসা করেছে।

পাঠকবৃন্দ, আশ্চর্যের বিষয় যে, আমাদের এই লেখিকা নামের কলংকও কানাডার ঐ বেহায়া নারীদের শরীরের অনাবৃত প্রতিবাদ মিছিলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি তার নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য নামক গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠায় 'আমাদের যাত্রা হলো শুরু' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেছেন। ঐ পুরো নিবন্ধটিতেই তিনি কানাডার বেহায়া নারীদের আচরণকে নারীর স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের দৃষ্টিতে (যেহেতু পুরুষদের উর্ধ্বাংগ অনাবৃত রেখে চলাফেরা করার অধিকার রয়েছে) এবং প্রতিবাদের প্রয়োজনে জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "সুস্থ্যতার প্রয়োজনে, শিল্পের প্রয়োজনে এবং প্রতিবাদের প্রয়োজনে যে নারীদেহ অনাবৃত হয়, তাকে আমার আদৌ অশ্লীল মনে হয় না।" (পৃঃ ৬৪)।

লেখিকাকে বলতে চাই, যে নারীরা আইন তৈরীর পর উধ্বাংগ অনাবৃত প্রতিবাদ মিছিল বের করেছে তারা কি আইন তৈরীর পূর্বেও ঐ অবস্থায় চলাফেরা করতো না? ঐ পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়ে থাকলে আইন তৈরীরইবা প্রয়োজন দেখা দিল কেন? আমাদের দেশে সরকার কিছুদিন পূর্বে সন্ত্রাস বিরোধী আইন তৈরী করেছেন, কারণ সন্ত্রাস দেশের সর্বত্র এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে জনতার অসন্তোষের মুখে অবশেষে এ প্রদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন। কানাডার সরকারও এমনিই এই অদ্ভুত আইনটি তৈরীর প্রয়োজন বোধ করেননি। নির্লজ্জ নারীদের বেহায়াপনায় অতিষ্ট সভ্য মানুষদের সমালোচনা এবং ডগ কালচারের হানা থেকে মনুষ্য সমাজকে রক্ষার প্রয়োজনেই এই আইনের জন্ম। আর 'তসলিমা বলছেন, প্রতিবাদের প্রয়োজনে, নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণে, নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের এ মিছিল। নারী স্বাধীনতা ও প্রগতির মানে কি তাহলে যাচ্ছেতাই করা? নারী অংগের ভূষণ খুলে ফেলা? কোনো সভ্য মানুষের প্রতিবাদের ভাষা কি তা হতে পারে, আর কোনো সভ্য মানুষ কি এ ধরণের নির্লজ্জতাকে বাহবা দিতে পারে? কিন্তু আমাদের সমাজের কলংক 'তসলিমা' এই বেহায়াদের বেহায়াপনাকে বাহবা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমি তৃতীয় বিশ্বের এক দগ্ধ নারী কানাডার প্রতিবাদী নারীদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

পাঠকবৃন্দ, উনি আসলেই আমাদের সমাজে এক দগ্ধ নারী। উনি দগ্ধ হয়ে হয়ে এখন অংগার হতে চলেছেন, কিন্তু এ সমাজ তার ব্যাথা অনুভব করছে না। উনি গরমে দগ্ধ হচ্ছেন কিন্তু অবলিলায় গায়ের জামা ছুড়ে ফেলতে পারছেন না। খোলা হাওয়ায় গা খুলে স্নান করতে পারছেন না। উনি ছ'সাতটা রক্ষিত্ রাখতে

চান, জারজ সন্তান দিয়ে দেশ ছেঁয়ে দিতে চান কিন্তু এ সমাজ তাকে এ অধিকার দিচ্ছে না। উনি ছিঁড়ে খুঁড়ে পুরুষ খেতে চান, একদলা মাংস পিন্ডের মত ভোগ করতে চান, নারী সমাজকে ধর্ষণ ব্যাভিচারে অভ্যস্ত করাতে চান, কিন্তু তাও পারছেন না। সুতরাং এ প্রতিকূল পরিবেশে চরম ব্যর্থতাহেতু বর্তমানে উনি ভীষণ দগ্ধরোগে আক্রান্ত এক নারী। এ রোগ থেকে আশু মুক্তি লাভ তার অত্যন্ত জরুরী। আর এজন্য দু'টিমাত্র পথই খোলা রয়েছে বলে অমার মনে হয়। একটি হলো আফ্রিকার কোন এক জংগলে নাকি এখনও আদিবাসীদের বসবাস রয়েছে, তাকেও ওখানে রপ্তানি করা। আর অন্যটি হলো, উপমহাদেশের বিশিষ্ট কোনো পশু চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করানো। ঐ চিকিৎসায় হয়তো উনি সেরে উঠতে পারেন, নচেৎ এ রোগের উন্মাদনায় কবে না আবার কানাডার বেহায়াদের চেয়েও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য উর্ধ্বাংগ-নিম্নাংগ অনাবৃত রেখেই রাজপথে নেমে পড়েন তাইবা কে জানে!

উন্মাদনার আর একটি হেতু

পাঠকবৃন্দ, তসলিমার এ বিভ্রান্তির কারণ পূর্বেই বলেছিলাম তার নাস্তিকতাবাদী দর্শন। ধর্ম, নৈতিকতা ও সংস্কার বিবর্জিত বিকৃত বিশ্বাসই তাকে এ বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও এর পেছনে আরো একটি হেতু রয়েছে বলে আমার মনে হয়, আর সেটি হলো তার ব্যক্তিগত জীবন। ব্যক্তিগত বা বিবাহিত জীবনে তসলিমা সুখি হতে পারেননি। একাধিক ইতিবাচক নেতিবাচক পদক্ষেপ সত্ত্বেও বর্তমানে তিনি ছিটকেপড়া বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপনকারী এক নারী। তসলিমা ইতিপূর্বে চারটি বিবাহ করেছিলেন বলে জানা যায়। যতদূর জানি তার প্রত্যেক স্বামীই ছিল সমাজে সুপরিচিত, প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব এবং চিন্তায় ও মননে অত্যাধুনিক পুরুষ। তা সত্ত্বেও তার ব্যক্তিগত জীবনে এ বিপর্যয় ঘটা অস্বাভাবিক বৈকি! যদিও কারো ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান বা আলোচনা মোটেই উচিত নয় এবং করতেও চাইনি, এতদসত্ত্বেও দু'টি সাপ্তাহিক পত্রিকায় তসলিমার দু'টি মন্তব্য দেখে এবং আলোচনার প্রসংগক্রমে এ অনধিকার চর্চাটুকু না করে পারছি না। তসলিমা নাসরিন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় তার কলামে উল্লেখ করেছেন যে, "পুরুষ নামক প্রাণীকে ভাল কিন্তু আমিও কম বাসিনি। এর বিনিময়ে আমাকে বসিয়ে রেখে একজন টানবাজার সেরে এসেছিল মনে আছে। আমি দু'শ গোলাপ নিয়ে তার অপেক্ষা করছিলাম, সে এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে নেচে উঠবে আশা ছিল। আমার কেবল আশায় বসতি। কেউ একজন

আমাকে ভালোবাসে আমাকে ছাড়া বাঁচবে না ইত্যাদি বলে টলে আমার ব্যাগ থেকে সাতশ ডলার আর গলার একটি সোনার চেইন হাতিয়ে নিয়েছিল। একজন আমাকে ভলোবাসে মুখে খুব বলতো, আড়ালে আমার কুৎসা রটাত। আর একজনতো বোতল বোতল মদ খেয়ে সারারাত ধরে পেন্টের বেল্ট খুলে আমাকে পেটাত।" (যায়যায়দিন, ১৬ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা)

উপরোক্ত মন্তব্যগুলো যদি তার বিগত স্বামীদের সম্পর্কে এবং তা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আধুনিকতা ও প্রগতির লেবাসদারী ব্যক্তিদের ভেতরের কুৎসিত চেহারা ও বিভৎসতা সম্পর্কে আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তবে একজন শিক্ষিতা সচেতন স্ত্রীকে বসিয়ে রেখে টান বাজার সেরে আসা এ মন্তব্যের পেছনে কতটুকু সত্যতা রয়েছে তা লেখিকাই বলতে পারেন। অবশ্য এ মন্তব্যকে আমি মিথ্যাও বলছিনা। অত্যাধুনিকতার নামে যৌন বিকৃতিকে আজকাল যেভাবে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে এবং পশু স্বভাবা মানুষদের দ্রুত বিকাশ সমাজে যেভাবে ঘটছে তাতে মিথ্যা বলার জোর পাব কোথায়!

লেখিকা সম্পর্কে তার বিগত স্বামীরা কোন মন্তব্য করেছেন কিনা আমার জানা নেই। তাদের বক্তব্য জানা গেলে হয়তো এসবের সত্যা মিথ্যা এবং নেতিবাচক সিদ্ধান্তের কারণ জানা যেতে। তবে তসলিমা নাসরিনের বই পুস্তক, লেখা-জোখা পড়ে তার লালিত বিশ্বাস সম্পর্কে আমার যে ধারণা গড়ে উঠেছে সে আলোকে বলতে চাই যে, আমাদের বাঙালী সমাজে একজন পুরুষ যত অত্যাধুনিক বা প্রগতিশীলই হোন না কেন, স্ত্রীর এ বিশ্বাসের সাথে খাপ খাইয়ে বা একে স্বীকৃতি দিয়ে পরিবার গঠন ও সুখী জীবন-যাপন অসম্ভব বৈকি। একথা এ কারণেই বলছি যে, বিবাহ হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর গড়ে উঠে ও টিকে থাকে। তসলিমা বেশ কিছুদিন পূর্বে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সাথে এক স্বাক্ষাৎকারে নারী স্বাধীনতার স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, "আমি আমার স্বামীর জ j একটি ডিম ভাজতেও অপমানবোধ করি।" এ বিশ্বাসের পাশা পাশি বাঙালী নারী হয়েও তসলিমা বিশ্বাস করেন পরকিয়া প্রেমে দোষ নেই', 'জরায়ুর স্বাধীনতা নারীর অধিকার' ' স্বামী ছাড়াও অন্য পুরুষের সন্তান ধারণ ও লালন অবৈধ নয়, সব সন্তানই বৈধ, জারজ একটি অসভ্য শব্দ। সতীত্ব মানেই যৌনাঙ্গকে অকেজো রাখা ইত্যাদি। এ ধরণের বিশ্বাস পোষণকারী একজন নারী শুধু বাঙালি সমাজে কেন, পাশ্চাত্য সমাজেও এরা স্ত্রী, গৃহিণী, বধু, চিরসাথী বা স্বামী- সন্তানের ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার যোগ্যতা রাখেনা। পাশ্চাত্য সমাজে এসব নারীরা অসভ্য পুরুষদের যৌনসংগি,

শয্যাসংগি বা লিভিংটুগেদার ধরণের অসভ্যপনার ভাগিদার হয় মাত্র। পরিণতিতে ধারণকৃত সন্তান আঁতুড়েই হত্যা, অথবা নিরুপায় হলে কোনো অনাথ আশ্রমে বা রাস্তার পাশ্বে রেখেই আরেক লম্পট পুরুষের সন্ধানে বের হয়। যার ফলে জারজ সন্তান লালন আজ পাশ্চাত্য সমাজে বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

তসলিমা নাসরিনের বৈবাহিক বা পারিবারিক জীবনে নেমে আসা এ চরম ব্যর্থতার জন্য তার এসব আদর্শ ও লালিত বিশ্বাসই দায়ী কিনা জানিনা বা লম্পট পুরুষেরা ঘরের বাইরে বাড়তি যে সুবিধা ভোগ করে থাকে নারীর সমঅধিকারের দাবি অনুযায়ী সে অধিকার আদায়ের দ্বন্দের ফল কিনা তাও বলতে পারবোনা। পাঠকবৃন্দ, তবে তাকে ধারণ বা তার লালিত বিকৃত বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দেয়ার মত যোগ্যতা যে এ সমাজে কোন পুরুষের নেই তা তসলিমা নিজেই বুঝে ফেলেছেন। আর সে কারণেই তিনি তার নির্বাচিত কলামের ১০২ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "আমি এ কথা খুব স্পষ্ট করেই জানি যে এই শহরে আমার যোগ্য একটি পুরুষও নেই। যে পুরুষের দিকে আমি তাকাই, কেনো না কোনো দিক থেকেই তারা আমার থেকে তুচ্ছ, অপকৃষ্ট। এই শহরে একটি পুরুষও নেই যার করতলে আমি দ্বিধাহীন রাখতে পারি আমার বিশ্বাসের সবকটি ভ ভুল।এই শহরে একটি সামান্য পুরুষও নেই যাকে আমি হৃদয়ের শেকড় বাকড় উপড়ে বলতে পারি, ভালোবাসি। এই শহরে আমার প্রতিভা ধারণ করার যোগ্যতা কোনো পুরুষের নেই। আমার মেধা ও মননের অগাধ সৌন্দর্য গ্রহণ করবার শক্তি নেই কারও। আমার বোধের নাগাল পাবার মত দীর্ঘ বাহু কারও নেই। আমার স্বাধীনতা ছুঁতে পারে এমন সাহস আমি কারও দেখিনা। আমাকে ভালোবাসবার দু:সাহস যেন কোনো কাপুরুষের না হয়।"

পাঠকবৃন্দ, উপরের কথাগুলো তসলিমা নাসরিন আমার মতে ঠিকই বলেছেন। এ সমাজে তার এই স্বতন্ত্র প্রতিভা, মেধা, বোধের নাগাল পাওয়া ও স্বাধীনতা ছুঁতে পারার যোগ্যতা ও সাহস লক্ষ লক্ষ পুরুষের মধ্যে যে কারো নেই তা অমিও বিশ্বাস করি। কারণ এ সমাজের ভালো লোকদের কথা বাদই দিলাম, বহু বড় বড় লোচ্ছা, লম্পট, বদমায়েশ রয়েছে যারা নিজেরা লাম্পট্যপনায় জড়িত সত্ত্বেও ঘরের স্ত্রীদের লাম্পট্যপনাকে মেনে নেয়া, তাদেরকেও এ অধিকার দান, বা লাম্পট্যপনা ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীর দাম্পত্য সমঅধিকার ও মর্যাদাবোধকে সমোন্নত করার মানসিকতা রাখেনা। শুধু এ সমাজে কেন, পাশ্চাত্য সমাজেও বিবাহিত জীবন ও লিভিং টুগেদারের ক্ষণস্থায়িত্বতা দেখে তারাও পেরেছে বলে মনে করার

কোন কারণ নেই। আসল কথা হলো, দুশ্চরিত্র লোকদের চরিত্রই এমন। এরকম মানসিকতা ও চরিত্রের অধিকারী না হলে তারা দুশ্চরিত্র হয় কি করে। অপরের অধিকার ও মর্যাদাবোধ সম্পর্কে সচেতনতা, নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শবোধ থাকলেতো আর দুশ্চরিত্র হওয়ার প্রশ্ন আসতোনা। এটা দুশ্চরিত্র পুরুষদের ক্ষেত্রে যেমন সত্য তেমনি নারীদের ক্ষেত্রেও।

সুতরাং তসলিমা নাসরিন সম্পূর্ণ বিরূপ পরিবেশে তার বিকৃত আদর্শ ও মানসিকতার চর্চা করতে গিয়ে এর অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ চার চারটি গোল্লাছুট দিয়ে (তসলিমার ভাষায় সংসার ভেঙে বেরিয়ে আসা) বর্তমানে গল্পের সেই লেজকাটা শিয়ালের মত অবস্থা তার। যে শিয়াল নিজের লেজ কাটা যাওয়ায় সব শিয়ালকে লেজের নানাবিধ অসুবিধার কথা বলে লেজা কাটার পরামর্শ দিয়েছিল, তসলিমা নাসরিনও ইনিয়ে-বিনিয়ে ধূর্ততার সাথে নারী সমাজকে সে পরামর্শটিই দিয়েছেন। তিনি এখন আর গৃহভৃত্য এবং গৃহবধুর মাঝে পার্থক্য খুঁজে পান না, পুরুষের বিয়ে করা মানে তার মতে নারীকে সংসার শেকল দুই-ই উপহার দেয়া, বিয়ে ব্যবস্থা তার কাছে নারী বিক্রির একটি পদ্ধতি। নাস্তিক জনষ্টুয়াট মিলের উদ্ধৃতি তুলে ধরে তিনি নারী সমাজকে বুঝাচ্ছেন যে, "আজকের দিনে বিবাহই হল একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে আইনগত দাস প্রথা বজায় আছে।" (নির্বাচিত কলাম পৃঃ-৩৮)

নির্বাচিত কলামের ১০৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "তুমি যদি নারী হও তুমি এইভাবে মৃত্যুকে অতিক্রম করে বেঁচে ওঠ। ওরা তোমাকে সতীত্ব শেখাবে, ওরা তোমাকে চিতায় ওঠাবে, ওরা তোমাকে নারীত্ব বোঝাবে ওরা তোমাকে মাতৃত্বের মাহাত্ম বর্ণনা করবে। এই সব ভুল শিক্ষা, এইসব পাপ, এইসব ফাঁদে একবার পা দিলেই ওরা তোমাকে নিয়ে নৃত্য করবে, ওরা তোমাকে চার দেয়াল দেবে, সোনার শেকল দেবে, ওরা তোমাকে পোষা টিয়ার খাঁচায় যেমন আহার দেওয়া হয় তেমন আহার দেবে। তুমি যদি মানুষ হও শেকড় ছিঁড়ে একবার দাঁড়াও। দু'হাতে শেকড় ছেঁড়, এই হাত তোমার। দু'পায়ে দৌড়ে যাও, এই পা- তোমার।"

পাঠকবৃন্দ, শেকল ছেঁড়ার গানের পাশাপাশি তিনি গোল্লাছুট' (সংসার ভাঙা) কবিতাও উপহার দিয়েছেন। গোল্লা থেকে ছুট দেবার আহবান জানিয়েছেন নারী সমাজকে। কিন্তু গোল্লা থেকে ছুট দিয়ে গন্তব্য কোথায়, বিকল্প উত্তম সমাধান কি তার কোন নির্দেশনা দেননি- দিতে পারেননি। সম্ভবত এ ব্যর্থতাকে ঢাকবার জন্যই জারজ সন্তানের স্বীকৃতির আওয়াজটা খুব জোর গলায় তুলেছেন।

ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তসলিমা ধর্মের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণকারী এক নারী। তার লেখনির পাতায় পাতায় রয়েছে চরম কটাক্ষ ও আক্রমনাত্মক ভাষা। তার মতে, ধর্ম পুরুষের তৈরী নারীকে দমিয়ে রাখার একটি ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি লিখেছেন, "এই পৃথিবীতে পুরুষ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কিছু কথা তৈরী করেছে। ওই কথার মধ্যে কিছুর নাম দিয়েছে ধর্ম, কিছুর নাম আইন (নির্বাচিত কলাম পৃঃ-৪১)। আরও লিখেছেন, "ওরা জেরুজালেমে, হিমালয়ে, হেরা পর্বতে বসে ধর্ম রচনা করেছে। এই ধর্মকে ওরা পবিত্র ঘোষণা করেছে। এই পবিত্রতার দোহাই দিয়ে ওরা তোমাকে (নারীকে)পাঁকে ফেলছে। " (নির্বাচিত কলাম পৃঃ ১০৩) ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তার অভিমত হল, ইসলাম হচ্ছে এক ধরণের বর্ম, পাপী ও পতিত মানুষের বর্ম, অত্যাচারী ও ব্যাভিচারী মানুষের বর্ম" (নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য পৃঃ ১১৬)।

পাঠকবৃন্দ, তসলিমার উপরোক্ত মন্তব্যের আলোকে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো, একজন নাস্তিকের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, বরং না পোষাটাই অস্বাভাবিক। 'ভুতুম পেঁছা' নামক বিশেষ পাখিটির যেমন দিনের আলো অসহ্য, রাতের অন্ধকারই তার কাম্য, সুতরাং দিনের আলোকে সে ভেংচি কেটে বিরক্তি প্রকাশ করে থাকে। একজন নাস্তিকের পক্ষেও তার নিজস্ব চিন্তা ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ধর্ম তথা আস্তিকতাবাদের প্রতি ঐ বিশেষ পাখিটির ন্যায় আচরণ মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আপত্তিটা তখনই আসে যখন মিথ্যা ও বিকৃতির আশ্রয় নিয়ে বিভ্রান্তির অপকৌশল গ্রহণ করা হয়, অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাসে আঘাত হানার হীন চেষ্টায় রত হয়। আমাদের তসলিমাও সে কাজটিই অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে করে গেছেন। তার চাতুরী ও মিথ্যাচারের কয়েকটি নমুনা থেকেই পাঠক তার বিকৃত রূপটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

১. সাপ্তাহিক 'যায়যায়দিন' পত্রিকার ১৯ জানুয়ারী' ৯৩ সংখ্যায় তসলিমা তার কলামের এক জায়গায় লিখেছেন, "কোরানে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, তুমি যদি মনস্থির কর তুমি তালাক বলবে, মনে রেখ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা। সুতরাং তালাক বললেই তালাক।"

পাঠকবৃন্দ, তসলিমা উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে একদিকে যেমন আয়াতের রেফারেন্স দেননি, অন্যদিকে একটি ভিন্ন উদ্দেশ্যের পরস্পর সম্পৃক্ত ২টি আয়াতের

এ খন্ডিত অংশটুকু তিনি বিকৃতভাবে তুলে ধরে এর ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এ অংশটুকু তুলে ধরেছেন সুরা বাকারার ২২৭ নং আয়াত থেকে। পরস্পর সম্পৃক্ত ২২৬ ও ২২৭ নং আয়াতটি হলো, "যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবে না বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। তারপর তারা যদি মিলে যায়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যদি তারা তালাক দেয়াই সংকল্প করে থাকে তবে জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন এবং সব জানেন।"

উপরোক্ত আয়াতের উল্লেখিত কসম খাওয়াকে শরীয়াতের পরিভাষায় "ঈলা" বলা হয়। ঈলা ছিল জাহেলিয়াতের যুগে নারীদের প্রতি এক ধরনের নির্যাতনের কৌশল। হযরত সাঈদ বিন মুসায়ের (রা) বলেন যে ঈলা ছিল জাহেলিয়াত যুগের একটি অত্যাচার। যখন স্ত্রীর সাথে কারো ভালবাসা থাকতো না এবং সে চাইত না যে তার স্ত্রীকে অন্য কেহ বিবাহ করুক তখন সে এরূপ কসম করে বসতো। ফলে স্ত্রীলোকটি স্বামীও পেতো না এবং তালাকও প্রাপ্ত হতো না, জীবন এভাবেই অতিবাহিত হতো। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এই নিয়মকে অনুসরণ করা হতো। অতপরঃ ইসলাম এরূপ অবস্থার সময়সীমা চার মাস নির্ধারন করে দিয়েছে।" (তাফসিরে নুরুল কোরআন দ্বিতীয় খন্ড, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্পাক চার মাস সময়সীমা নির্ধারণ করে নারীদের প্রতি এ ধরণের নির্যাতনের অবসান ঘটিয়েছেন। হয় এই চার মাসের মধ্যে পুনরায় পারস্পরিক স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক স্থাপন করে অন্যথায় স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক একেবারেই ছিন্ন করে (যাতে ভিন্ন পথ গ্রহণ করা সহজ হয়)। উপরন্তু শেষের আয়াতে কসম খাওয়ার পেছনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও আল্লাহ্পাক সতর্ক করে দিয়েছেন অর্থাৎ অকারণ ও অযৌক্তিকভাবে যদি তালাক প্রদানের উদ্দেশ্যেই তা করে থাক তবে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বেখবর নন, তোমার বাড়াবাড়ি সম্পর্কে আল্লাহ্ অবহিত আছেন।

কোরানপাকের সকল তাফসিরকারক উপরোক্ত আয়াতের এ ধরণের ব্যাখ্যা করেছেন। অথচ তসলিমা দুটি পরস্পর সম্পৃক্ত আয়াতের খন্ডিত অংশ বিকৃতভাবে তুলে ধরে এর বিকৃত অর্থ করে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন।

২. তাছাড়া তিনি ঐ একই কলামে লিখেছেন, "ভারতে ১৯৮৬ সালের আগে মুসলমান তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী 'ইদ্দত' এর সময় স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ পেত

না। ১৯৮৬ সালে সুপ্রিম কোর্ট শাহবানু মামলায় তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শাহবানুর প্রাক্তন স্বামীকে দিয়েছিল। এই নিয়ে ভারতের মুসলমান সমাজ হৈ চৈ শুরু করে, তারা বলে প্রাক্তন স্বামীর উপর খোরপোষের দায়িত্ব অর্পণ করে শরীয়তের বিধান লংঘন করেছে। শেষ পর্যায়ে ১৯৮৬ সালের ৮ই মে তারিখে সংসদে তালাকের পর অধিকার সংরক্ষণ বিলটি পাস হয়, এতে ইদ্দত এর সময় স্বামীকে স্ত্রীর খোরপোষ দেবার কথা বলা হয়েছে।"

পাঠকবৃন্দ, তসলিমা এখানেও অত্যন্ত সচেতনভাবে একটা নির্লজ্জ মিথ্যাকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। শাহবানুর মামলার ঘটনাটি ছিল সুপ্রিম কোর্ট তালাকপ্রাপ্তা শাহবানুর ভরনপোষণের দায় দায়িত্ব ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার পরও তার প্রাক্তন স্বামীর উপর ছাপিয়ে দিয়েছিল। ফলে মুসলিম সমাজ শরীয়ত বিরোধী এ রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। মুসলিম সমাজের আপত্তির মুখে অবশেষে ভারতীয় সংসদ শরীয়তের স্বপক্ষে (অর্থাৎ ইদ্দত কালেই শুধু খোরপোষ প্রদান) আইন তৈরী করতে বাধ্য হয়। অথচ তসলিমা ভারতে ১৯৮৬ সালের আগে মুসলমান তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ইদ্দত এর সময় স্বামীর কাছ থেকে খোরপোষ পেতনা।' বলে মন্তব্য করে এ মামলা ও ভারতীয় পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইন সম্পর্কে সচেতনভাবে একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। তার এ মিথ্যা মন্তব্যের অর্থ দাঁড়ায় ভারতীয় মুসলমানরা নিজেরাই শরীয়ত মানতনা, ভারতীয় পার্লামেন্ট আইন তৈরী করে শরীয়ত মানতে তাদের বাধ্য করেছে। বিভ্রান্তি আর কাকে বলে!

৩. ঐ নিবন্ধেই তিনি আরো লিখেছেন, "বাংলাদেশে ১৯৬১ সালের ব্যক্তিগত আইন স্ত্রীকে বিশেষ বিশেষ কারণে অধিকার দিয়েছেন স্বামীকে তালাক দেবার, যদিও শরীয়তি আইন স্ত্রীকে তালাক দেবার অধিকার দেয়নি। প্রথম স্বামীর আবার বিবাহের জন্য তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহের প্রয়োজন হয় না। এখন না শরীয়তি না সভ্য এমন এক অবস্থায় আছে মুসলিম বিবাহ আইন। এই আইন কিছুটা শরীয়ত নিয়ে কিছুটা সভ্যতা নিয়ে অদ্ভুত একটি অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।"

পাঠকবৃন্দ, এখানেও তসলিমা শরীয়তের তালাক সংক্রান্ত বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ সমাজের এক শ্রেণীর লোকদের বিকৃত আচরণকে শরীয়তের বিধান বলে ধরে নিয়ে ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইনের তালাক সংক্রান্ত ধারা উপধারা সম্পর্কে সুস্পষ্ট উপলব্ধি না নিয়েই মুসলিম আইনকে 'না শরীয়তি না সভ্য' বলে মন্তব্য করে অসভ্য আইন হিসেবে ইংগিত করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন।

তসলিমাকে বলতে চাই বাংলাদেশের ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইন যে যে কারণে স্ত্রীকে দাম্পত্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে নতুন জীবন গড়ার অধিকার দিয়েছে তা কোরান-হাদীস তথা ইসলামী শরীয়তকে কেন্দ্র করেই রচিত। ইসলামী শরীয়ত সুস্পষ্টভাবে নারীদেরকে সে অধিকার দিয়ে রেখেছে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতিত হলে, ভরণ-পোষণে অক্ষম হলে, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত বা যৌন জীবনে অক্ষম হলে, স্বামী দুশ্চরিত্রবান হলে বা দীর্ঘদিন যাবত নিখোঁজ থাকলে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী একজন নারীর পূর্ণ অধিকার রয়েছে বৈবাহিক সম্পর্ক চিহ্ন করার। তাছাড়া আল্লাহ্পাক পবিত্র কোরানে বলেছেন, "তোমরা যদি একথা চিন্তা করে ভয় পাও, স্বামী-স্ত্রী দুজনে আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তাহলে স্ত্রী যা-ই বিনিময় মূল্য দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাতে তাদের দু'জনের কোন গুনাহ হবে না।" (সুরা বাকারা-৩৩৯) সুতরাং তালাক বা দাম্পত্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার অধিকার নারীকে শরীয়ত দেয়নি তসলিমার একথা ঠিক নয়।

এছাড়া তিনি শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ সমাজের এক শ্রেণীর লোকদের (সূরা বাকারার ২৩০ নং আয়াতের অপব্যাখ্যার ফলে সৃষ্ট) বিকৃত আচরণকে (অর্থাৎ একই সাথে তিন তালাক প্রদান এবং পূর্ব চুক্তি মোতাবেক অন্যজনের সাথে বিয়ে দিয়ে সাথে সাথে তালাক দেয়ার পর পুনরায় প্রথম স্বামীর সাথে বিয়ে) শরীয়তের বিধান বলে ধরে নিয়ে যে কুৎসীত মন্তব্য করেছেন এতে ঐসব অজ্ঞ লোকদের পাশাপাশি শরীয়ত সম্পর্কে তার নিজের অজ্ঞতাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

তসলিমাকে বলছি, সমাজের অজ্ঞ-মূর্খ লোকদের এসব বিকৃতির সাথে ইসলামী শরীয়তের কোন সম্পর্ক নেই। এই বইয়ের তালাক প্রথম সংক্রান্ত নিবন্ধে এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সুতরাং এখানে আর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন দেখছি না।

৪. তসলিমা তার নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য নামক নিবন্ধ সংকলনের ১১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "উত্তরাধিকার আইনে নারীকে বঞ্চিত করেছে ইসলাম, পুত্র সন্তানের জন্য রেখেছে দু'ভাগ, কন্যা সন্তানের জন্য এক ভাগ। এই অসভ্য উত্তরাধিকার আইনটি এই দেশে প্রচলিত।"

তসলিমার উপরের মন্তব্য সম্পর্কেও এখানে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি না। কারণ এ বিধানের বিস্তারিত যৌক্তিকতা ইসলামের উত্তরাধিকার আইন সংক্রান্ত নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। তবে তিনি তার নির্বাচিতার কলাম-এ ১১৩

পাতায় এবং 'যায়যায়দিন' পত্রিকার ২৭এপ্রিল, ৯৩ সংখ্যায় কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছেন। প্রশ্নগুলো হলোঃ (১) মৃত বাবা ও মায়ের অন্যান্য উত্তরাধিকারীর অবর্তমানে একমাত্র ছেলে তাঁর বাবা ও মায়ের সব সম্পত্তির মালিক হন এবং এক্ষেত্রে একমাত্র মেয়ে হলে তিনি দুই ভাগের এক ভাগ পান কেন? (২) যদি কেউ তার মা ও বাবাকে রেখে মারা যায় তবে মৃত সন্তানের সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে মা পাবে তিন ভাগের এক অংশ আর বাবা পাবে তিন ভাগের দুই অংশ। আর যদি তার মা, বাবা, ভাই-বোনকে রেখে মারা যায় তবে মা পাবে ছয় ভাগের এক অংশ (যেহেতু ভাই-বোন রয়েছে) আর বাবা পাবে ছয় ভাগের পাঁচ অংশ (যেহেতু বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় ভাই বোন পাবে না) সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে এ বৈষম্য কেন? (৩) স্ত্রী মারা গেলে স্বামী তার সম্পত্তির চার ভাগের একভাগ পান, তাঁদের কোনও সন্তান না থাকলে স্বামী দুই ভাগের একভাগ পান-অথচ স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তার সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ পান। স্ত্রী এবং স্বামীর ক্ষেত্রে সম্পত্তি বন্টনের এমন অসাম্য কেন?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর আলোকে তসলিমাকে বলতে চাই, খোদা সৃষ্ট এবং খোদা প্রদত্ত ক্ষুদ্র জ্ঞানের অধিকারী মানুষ হয়ে অনন্ত জ্ঞান ভান্ডারের অধিকারী মহান রাব্বুল আলামিনের উপর খোদকারী করা মানুষের শোভা পায় না। এসবের পিছনের ন্যায় ও যৌক্তিকতা আল্লাহ্‌তায়ালাই ভাল জানেন। তারপরও আপনি যখন বিভ্রান্তি ছড়াবার পথ বেছে নিয়েছেন তখন বাস্তব উপলব্ধি থেকে দু'চার কথা না বলে পরছিনা।

প্রথমেই বলতে চাই আল্লাহ্‌তায়ালা প্রদত্ত কোন বিধানই ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি থেকে রচিত হয়নি, এসব বিধান রচিত হয়েছে সমাজের মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ তথা দায়-দায়িত্ব ও প্রয়োজনের দিক চিন্তা করে। কিসে মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হবে সেটাই এখানে মুখ্যতা লাভ করেছে। এর মধ্যে নারী-পুরুষের বেধ বৈষম্য আবিস্কারের প্রচেষ্টা মানুষের জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা ও নীচতারই পরিচয় স্পষ্ট করে তোলে।

আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলতে চাই যে, ভাইহীন একমাত্র কন্যা পৈত্রিক সম্পত্তির অর্ধেক পান কারণ সম্পূর্ণ আর্থিক দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত ঐ কন্যার জন্য ঐ অর্ধেক সম্পদই তার প্রয়োজনাতিরিক্ত যেহেতু তার সকল দায়-দায়িত্ব ও ব্যয়ভার রয়েছে তার স্বামীর উপর। ঐ কন্যাকে যদি পুরো সম্পদই দেয়া হতো তাহলে দায়-দায়িত্বহীন একজন মানুষের কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত এ সম্পদগুলো পুঞ্জিভূত হয়ে পড়তো যা হতো সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন ও কল্যাণ নীতির

সম্পূর্ণ পরিপন্থি। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহপাক কন্যাকে/কন্যাদেরকে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অধিক নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নির্দিষ্ট হারে সম্পদ প্রদান করে বাকী সম্পদ পিতৃব্য স্বজনদের মাঝে নির্দিষ্ট হারে বন্টনের ব্যবস্থা করে একদিকে যেমন প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদকে কেন্দ্রীভূত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন, অন্যদিকে ঐ সম্পদ একাধিক মানুষের কল্যাণে আসার ক্ষেত্রও সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে একমাত্র ভাই পুরো সম্পদেরই মালিক হওয়ার পেছনে যৌক্তিক দিক হলো ভাইয়ের ক্ষেত্রে (এ বইয়ের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিবন্ধে আলোচিত) দায়-দায়িত্বের কথা বিবেচনা করলে তার উপর অর্পিত বহুবিধ খরচের খাতের কারণে সম্পদ পুঞ্জিভূত বা অব্যবহৃত থাকার সম্ভাবনা নেই। এ সম্পদ বৃহত্তর মানুষের কল্যাণে ব্যয়িত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

আপনার দ্বিতীয় আপত্তির জবাবে বলতে চাই যে, মৃত সন্তানের সম্পদে 'মায়ের চেয়ে বাবা বেশী পাওয়ার যৌক্তিক দিক হলো মা সংসারে সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্বমুক্ত একজন মানুষ। তার সার্বিক দায় দায়িত্ব ও খরচের ভার রয়েছে তার স্বামীর উপর। সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত রেখেও আল্লাহ্পাক বিভিন্ন খাত থেকে মাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা মায়ের সার্বিক আর্থিক নিরাপত্তাকে আরও সুদৃঢ় করেছে। পক্ষান্তরে বাবা মায়ের চেয়ে বেশী পাওয়ার যৌক্তিক দিক হলো বাবা আর্থিক দায়-দায়িত্বমুক্ত মানুষ নন। তার উপর (মৃত সন্তানের মা) স্ত্রীর দায়িত্বসহ একটি সংসারের পুরো দায়-দায়িত্ব ও খরচের খাত রয়েছে। সুতরাং মায়ের চেয়ে পিতার অতিরিক্ত পাওনাটাই যৌক্তিক। এতে বিভ্রান্তির অবকাশ নেই।

তৃতীয় আপত্তির জবাবে বলতে চাই, মৃত স্ত্রীর সম্পদে স্বামীর পাওনা স্ত্রীর তুলনায় সর্বাবস্থায় দ্বিগুন হওয়ার যৌক্তিক দিক হলো স্বামীর উপর রয়েছে তাদের উভয়ের সন্তান-সন্ততি (যদি থাকে) ও পরিবারের পুরো দায়িত্ব। তাছাড়া স্বামীর বৃদ্ধ বাবা-মা, ছোট ভাই বোন থাকলে তাদের দায়-দায়িত্বসহ আত্মীয়-স্বজনের দায়-দায়িত্ব থেকে স্বামী মুক্ত নয়। উপরন্তু স্বামী পুনরায় বিবাহ করে সংসারি হতে চাইলে মোহরানা ও বিয়ের খরচাদিসহ আর একজন নারী ও সন্তানাদির পূর্ণ দায়িত্ব তাকে মাথায় নিতে হয়। পক্ষান্তরে এক্ষেত্রে স্ত্রীর উপর একদিকে যেমন কারো দায়-দায়িত্ব বর্তায়না, অন্যদিকে ইসলামের নীতি অনুযায়ী তার পূর্ণ দায়িত্ব সন্তানদের উপর এবং সন্তানের অবর্তমানে বাপ-ভাইদের উপর বর্তায়। এছাড়া তিনি যদি অন্য কোন পুরুষকে দ্বিতীয় বিয়ে করেন সেক্ষেত্রে তার দায়-দায়িত্ব চলে যায় তার স্বামীর উপর। সুতরাং দায়-দায়িত্বের দিক চিন্তা করলে এই সৃষ্ট বৈষম্যকে অযৌক্তি বলে মনে করার বা বিভ্রান্তি ছড়াবার কোন সুযোগ নেই।

৫. তসলিমা তার 'নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য' নামক নিবন্ধ সংকলনের ৮২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "আমার এক সময় খুব ইচ্ছে ছিল পুরুষ যেমন চার বিয়ে করে এক বাড়িতে চার বউ নিয়ে জীবন যাপন করবার অধিকার রাখে, তেমন আমিও চার বিয়ে করে চার স্বামী নিয়ে জীবন কাটাবো। অনেক মেয়েই এ ঘটনা দেখে উৎসাহী হবে আর মানুষের তখন টনক নড়বে যে, যে বিধানটি এ সমাজে প্রচলিত তার উল্টো চর্চা শুরু হলে কেমন দেখায়। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।"

নির্বাচিত কলামের ১৪০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "ইসলাম ধর্মে পুরুষের জন্য চারটি পর্যন্ত বিয়ে করবার নিয়ম প্রচলিত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) চৌদ্দটি বিয়ে করেছিলেন। মহানবীর আদর্শ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অনুপ্রানিত করে।"

"যায়যায়দিন" '১৫ ডিসেম্বর ৯২ সংখ্যায় লিখেছেন, "কিছু কিছু নিকৃষ্ট প্রথাকে মানুষ এখনও সমাজে জিইয়ে রাখছে। 'বহুবিবাহ' প্রথাটি নিকৃষ্ট প্রথা হিসেবে নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য। একবার এক বিজ্ঞ সমাজতাত্ত্বিককে জিজ্ঞেস করেছিলাম পুরুষের বহু বিবাহের অধিকার আছে, নারীর নেই কেন?"

পাঠকবৃন্দ, তসলিমার উপরোল্লিখিত বিকৃত আকাঙ্খা, ক্ষোভ এবং প্রশ্নের জবাব এখানে আর নতুন করে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না। কারণ, পুরুষের বহু বিবাহ, নারীর একাধিক স্বামী নয় কেন এবং আমাদের নবীজীর একাধিক বিবাহ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা এই বইয়ের কয়েকটি নিবন্ধে পূর্বেই করা হয়েছে। আশা করি তা পাঠের পর এসব নিয়ে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ, সংশয় থাকার কথা নয়। আসলে এ মহিলা বিভ্রান্তি ছড়াবার কৌশল হিসেবেই বিকৃত উপস্থাপনার মাধ্যমে এ জাতীয় বিষয়গুলোকে টেনে এনেছেন। তার লেখনির ছত্রে ছত্রে এ জাতীয় অপকৌশলে ভরপুর। এদেশের পাঠক সমাজ এসব লেখায় প্রভাবিত হওয়াতো দূরের কথা বরং তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে প্রচন্ড ক্ষোভ, ঘৃণা ও রোষের। এ নাস্তিক মহিলাই সি-এন-এন টিভিতে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে পায়ের উপর পা তুলে বাম হাতে পবিত্র কোরান আর ডান হাতে জলন্ত সিগারেট টানতে টানতে পবিত্র কোরানের কোথায় কোথায় ভুল রয়েছে তা দেখাবার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। এ মহিলাই ভারতীয় এক পত্রিকায় স্বাক্ষাৎকার দিয়ে কোরান মানুষের তৈরী, মানুষের বানানো বলে মন্তব্য করেছেন। এই লেখিকা নামের কলংকই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে 'হারামজাদা বাংলাদেশ' বলার দুঃসাহস এবং চির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এদেশে কল্পিত হিন্দু নির্যাতনের কাহিনী ফেঁদে ভারতীয় চরম সাম্প্রদায়িক, কাপালিক দাদাবাবুদের বগল বাজাবার সুযোগ

করে দিয়েছেন। তার এহেন দেশ, সমাজ, ধর্ম, নীতি-নৈতিকতা বিরোধী অপতৎপরতার ফলে এদেশের আপামর জনতার রুদ্র রোষের শিকার হয়ে তাকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে। এ জাতীয় কুলাংগার, এইডস এর জীবানুর চেয়েও ভয়ংকর, লেখিকা নামের কলংকদের শাহজালালের এই দেশ, বার আউলিয়ার এই পূণ্য ভূমিতে এদের স্থান হবে না, এই দেশ, এই মাটি, এই আবহাওয়া এইসব নর্দমার কীটদের গ্রহণ করবে না। তেমন দুঃসাহস যেন এদের আর না হয়।

আত্মপ্রবঞ্চনা ও বোধোদয়

সমস্যা সঙ্কুল এ পৃথিবীতে আদিকাল থেকেই দু'শ্রেণীর লোক মানুষকে মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখিয়ে আসছেন। এদের একদিকে রয়েছে নবী-রাসূলগণ আর অন্যদিকে রয়েছে দার্শনিকগণ।

নবী-রাসূল এবং দার্শনিকদের মধ্যে মূল প্রভেদ হলো, নবী-রাসূলগণ নিজস্ব কোন মতামত বা অভিমত মানুষের ওপর চাপিয়ে দেননি। এ পৃথিবীকে যিনি সুন্দর-সুশোভিত করে সৃষ্টি করেছেন, তারই সৃষ্টির সেরা মানুষগুলো কোন প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিতে জীবন যাপন করলে 'সৃষ্টির সেরা' শব্দটির মর্যাদা রক্ষা পাবে, সমস্যা সঙ্কুল জীবন সুখ ও আনন্দময় হয়ে উঠবে, তারা তারই পথ নির্দেশিকা ওহির মাধ্যমে মহান স্রষ্টা হতে যুগে যুগে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন মাত্র।

অন্যদিকে দার্শনিকগণ অনেকটা এর বিপরীত। তারা সমস্যাগ্রস্ত এ পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে এর সমাধানকল্পে তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে মতবাদ বা মতাদর্শ সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে তা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইতিহাস আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষেরা তাদের সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কেউ দার্শনিকদের মতকে গ্রহণ করেছেন, আর কেউ গ্রহণ করেছেন নবী-রাসূলগণের মতকে। এ দুই মতের স্বপক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্ক ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত পৃথিবীর আদিকাল থেকে হয়ে আসছে এবং আজ পর্যন্ত তা অব্যাহত রয়েছে।

সমস্যার সমাধানে পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে সকল দার্শনিক কখনো ঐকমত্যে পৌছতে পারেননি। এক একজন এক এক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। একজন অন্যজনের অভিমত ভুল প্রমাণ করেছেন। এভাবে দার্শনিকের মতের ভিন্নতায় তাদের অনুসারীরাও আজ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আছেন।

অন্যদিকে সকল নবী-রাসূলই মানুষকে মানুষের গোলামী পরিত্যাগ করে এক আল্লাহ্‌র গোলামী করার একই আহ্বান জানিয়েছেন এবং মহান আল্লাহ্‌তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত যুগোপযোগী বিধান প্রচার করে মানুষকে হেদায়াত দান করেছেন। কিন্তু প্রত্যেক নবীর কিছু সংখ্যক অনুসারীদের ভুল ব্যাখ্যা, ভুল প্রচারণা ও সত্য গোপন করার কারণে আজ আমরা বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত হয়ে পড়েছি।

মহান স্রষ্টা বিভিন্ন সময়ে সমস্যার ধরণ ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে যুগোপযোগী সমাধান পাঠিয়েছেন। একটি নির্দিষ্ট সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার পর সমস্যার ধরণ ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে সেই সমাধান পদ্ধতির যখন উপযোগিতা হ্রাস পেয়েছে, তখন আবার নতুন নবী-রাসূলের মাধ্যমে নতুন সমস্যার উপযোগী সমাধান পদ্ধতি পাঠিয়েছেন। এভাবে যুগোপযোগী নবী-রাসূলগণের আগমন অব্যাহত থাকার পর মহান রাব্বুল আলামীন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে সর্বশেষ নবী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সব সমস্যার সমাধান উপযোগী মতাদর্শ বা ধর্মগ্রন্থ আল-কোরআনকে তাঁর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। আল-কোরআনে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থ ও নবীগণের যেমন স্বীকৃতি রয়েছে, তেমনি তার পাশাপাশি পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোর অনুপযোগিতা ও তা বাতিলের ঘোষণাও রয়েছে।

শুধু তাই নয়, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোতেও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সর্বশেষ নবী হিসেবে এবং সর্বকালের সব সমস্যার সমাধান উপযোগী ধর্মগ্রন্থ আল-কোরআন নিয়ে আগমনের সুসংবাদ থাকা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর লোক পবিত্র ধর্মীয় নির্দেশকে উপেক্ষা করে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে নবী হিসেবে এবং আল-কোরআনকে জীবন বিধান হিসেবে মেনে না নিয়ে পূর্ববর্তী যুগ অনুপযোগী ধর্মগ্রন্থকে আঁকড়ে ধরে আছেন।

এর ফলে ধর্ম বিশ্বাসীগণ এক আল্লাহ্‌ এবং নবী-রাসূলগণ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্যার সমাধান পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আজ আমরা একদিকে যেমন বিভক্ত হয়ে পড়েছি, অন্যদিকে বর্তমান যুগের সমস্যা তার যুগোপযোগী সমাধান পদ্ধতিতে (আল-কোরআন) না খুঁজে পরিত্যক্ত এবং যুগ অনুপযোগী সমাধান পদ্ধতিতে হাতড়ে খুঁজে ব্যর্থ হয়ে শুধুমাত্র হীনমন্যতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে এমনসব কাজ করে বসেছি– যা রীতিমত শিরক্‌ ও আত্মঘাতির নামান্তর।

ইয়াহুদি, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মজগত আজ তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্তমান যুগের সকল সমস্যার নির্ভুল সমাধান না পেয়ে আল্লাহ্‌কে সার্বভৌম শক্তি মেনে নেয়া সত্ত্বেও আজ তারা দার্শনিকদের দ্বারা নির্দেশিত সমাধান পদ্ধতির দারস্থ

হচ্ছেন- যা চরম মুনাফেকী ও শিরকি বৈ কিছু নয়। সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় দর্শন তথা দার্শনিকদের জয়-জয়কার। ঐসব সভ্যতায় ধর্ম আজ দর্শনের কাছে চরমভাবে মার খেয়ে চরম অবহেলিত অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আজ ঐসব ধর্মের ধারক-বাহকেরা ধর্মকে কিছু অনুষ্ঠানাদিতে সীমাবদ্ধ রেখে আত্মতৃপ্তি অনুভব করছেন।

অন্যদিকে সর্বশেষ এডিশন আল-কোরআন তথা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও এক শ্রেণীর কোরআন বিশ্বাসী অজ্ঞতার কারণে কোরআনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে অথবা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শনপন্থীদের প্রচার-প্রপাগান্ডায় বিভ্রান্ত হয়ে তারাও আজ চরম শির্‌কি ও মুনাফেকীর দিকে পা বাড়িয়েছেন।

এসব দ্বিচারি ধর্মপন্থীদের ধর্মের প্রতি আস্থাহীনতা ও বিশ্বাস ঘাতকতার কারণে দীর্ঘদিন থেকে দর্শন তথা দর্শনপন্থীদের জয়-জয়কার রব উঠে ধর্ম চরম অবক্ষয়ের মুখে পতিত হয়েছে।

আজ বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় পুণর্জাগরণের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বিশ্বব্যাপী মানুষের ধর্মীয় বিধি-বিধান নিয়ে চিন্তা-ভাবনার ফলে নতুন আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব তথা সর্বশেষ এডিশন আল-কোরআনে বিশ্বাসীরা যদি বিভ্রান্তিকর প্রচারণার শিকার না হয়ে তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল করে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও যদি যুগ সমস্যার সমাধান অনুপযোগী ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে সচেতন ও দর্শনপন্থীদের দ্বারস্থ হওয়াকে অপমান বোধ করে এবং আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বে সত্যিকার বিশ্বাসী ও তা বাস্তব প্রয়োগে আকাঙ্খী হয়ে ওঠে, তবে অচিরেই পৃথিবীতে এমন এক বিপ্লব সংঘটিত হবে, যে বিপ্লবে ভেসে যাবে সকল মতবাদ ও মতাদর্শ। প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব এবং বিশ্ব মানবতার জন্যেও বয়ে আনবে অনাবিল সুখ-শান্তি ও পরকালীন মুক্তি।

মানব প্রকৃতি, মানব কল্যাণ ও মানব প্রতারণা

মানুষ মাত্রই যে প্রত্যেকে 'আত্মকেন্দ্রিক' ও 'স্বার্থপর'– এ উক্তিকে হয়তো অনেকে মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন। কিন্তু একথা সত্য যে, পৃথিবীর স্বনামধন্য ব্যক্তি থেকে শুরু করে প্রত্যেকেই, যে যেটুকু সমাজের জন্য অবদান রেখেছেন, ব্যক্তিস্বার্থ ক্ষুণ্ন করে কেউ কিছু করেছেন বলে সহজে মেনে নেয়া যায় না। মানুষ, সে নিজেরই হোক বা সমাজেরই হোক, স্বার্থ-চিন্তা তাড়িত না হয়ে কোন কাজেই অগ্রসর হয় না।

তবে স্বার্থ আদায়ের ধরণ ও প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের। এ প্রকারভেদের কারণে আমরা কাউকে 'নিঃস্বার্থ', 'দেশপ্রেমিক' বলে অভিহিত করি; আর কাউকে 'অখ্যাত' বা 'কুখ্যাত' বলে চিহ্নিত করি। ব্যক্তিভেদে নিজের বা সমাজের কোন কাজে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে মানুষ প্রথমতঃ দু'ধরণের স্বার্থকে চিন্তা করে– কেউ 'ভোগভিত্তিক স্বার্থ' আর কেউ 'সুনামভিত্তিক স্বার্থ।' কারো ক্ষেত্রে উভয়টিও হতে পারে। আবার এ স্বার্থ কখন, কোন প্রক্রিয়ায় এবং কিসের ভিত্তিতে আদায় হবে, সেটা নির্ভর করে মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস, আদর্শ ও প্রকৃতির ওপর।

চিন্তা, বিশ্বাস ও আদর্শের ভিত্তিতে মানুষকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়– (১) জড়বাদী ও (২) আধ্যাত্মবাদী।

একজন পূর্ণ জড়বাদে বিশ্বাসী, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি, তার পরিবর্তন-রূপান্তর এবং প্রাকৃতিক সুশৃংখল কার্যক্রমের পেছনে কোন শক্তির রহস্য ও হাত রয়েছে বলে স্বীকার করেন না বা ইহকালীন কাজের ভিত্তিতে পরকালে শাস্তি ও পুরস্কারে যার আস্থা নেই, পৃথিবীকেই সবকিছু মনে করেন, তার স্বার্থ আদায়ের ধরণটি হবে তাৎক্ষণিক। অর্থাৎ ভোগভিত্তিক স্বার্থ হোক আর সুনামভিত্তিক স্বার্থই হোক, এ পৃথিবীতেই সে পূর্ণভাবে তা আদায় করে নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আর যেহেতু পরকাল

বা জবাবদিহির ভয় নেই, সুতরাং ন্যায়-অন্যায় বোধও তার থাকে না- থাকতে পারে না। সমাজের প্রচলিত আইন ও জনরোষের ভয়ই শুধু তাকে কিছুটা সংকুচিত করে রাখে। এ দু'য়ের ভয় যার নেই, এমন কোন কাজ নেই, যা সে করতে পারে না।

আস্তিক শ্রেণীর লোকদেরকে আবার দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়– এক শ্রেণীর লোক, যারা দুনিয়ার প্রতিটি কাজের জন্য পরকালে জবাবদিহি, এর ভিত্তিতে শাস্তি ও পুরস্কার নির্ধারিত হওয়ায় বিশ্বাস করেন এবং পরকালে পুরস্কারও পেতে চান; কিন্তু দুনিয়ার তাৎক্ষণিক পুরস্কার বা স্বার্থকেও তারা ছেড়ে দিতে চান না। তাই অনেক সময় দেখা যায়, তারা দুনিয়াতে ভোগ বা সুনামভিত্তিক স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে ন্যায়-নীতিবোধকেও মাঝে মাঝে জলাঞ্জলী দিয়ে থাকেন; আবার এর জন্য অনুতপ্ত, সংকোচ বোধ ও দোদুল্যমান রোগে ভুগতে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে, এ শ্রেণীর লোক কিছু কিছু ক্ষুদ্র স্বার্থকে ছেড়ে দিয়ে সমাজের কাছে নিজেকে গ্রহণীয় ও বরণীয় করে তুলে বৃহত্তর স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন।

তাই এদের সম্পর্কে মন্তব্য শুনতে হয়, 'এই ভাল লোকটাও এমন কাজ করতে পারেন!' -এর একমাত্র কারণ হলো, স্রষ্টার অস্তিত্ব, পরকালীন শাস্তি ও পুরস্কারের প্রতি গভীর আস্থার অভাব। কম আস্থার কারণেই তারা উভয় সংকটে পড়ে যান এবং তাৎক্ষণিক স্বার্থ আদায়ের মোহে ন্যায়-নীতিবোধকে ছাড়িয়ে জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন করে থাকেন।

আর এক শ্রেণীর লোক রয়েছে– যারা স্রষ্টার অস্তিত্ব, স্রষ্টা প্রদত্ত আইন, ন্যায়-নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে দুনিয়ার প্রতিটি কাজের জন্য পরকালে জবাবদিহি এবং পরকালের শাস্তি-পুরস্কারে গভীরভাবে আস্থাশীল। এ শ্রেণীর লোকেরা এ গভীর আস্থাশীলতার কারণে ন্যায়-নীতিবোধ লংঘন করে দুনিয়াবি স্বার্থ তাড়িত হয়ে কোন কাজ করে না। পারলৌকিক স্বার্থচিন্তাই এদের সকল কাজের প্রেরণা। সুতরাং জনরোষ বা দুনিয়ার শাস্তির ভয়ও যেখানে থাকে না, পারলৌকিক ভয়ের কারণে এদের দ্বারা সমাজে সীমা লংঘনজনিত কোন কাজ সংঘটিত হতে পারে না। এরা দুনিয়ার সকল কাজের স্বার্থ পরকালে আদায় করে নিতে চায়।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা স্পষ্ট যে, সমাজের একজন সদস্য হিসেবে সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব, কর্তব্য ও অবদানের বিনিময়ে যারা তাৎক্ষণিক অর্থাৎ পৃথিবীতেই পূর্ণ স্বার্থ আদায় করে নিতে চান, এরা ন্যায়-নীতিবোধের

গন্ডিতে থেকে সত্যিকারভাবে মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে অক্ষম। এদের দ্বারা জনস্বার্থ ঠিকভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে না। অবশ্য যারা পৃথিবীতে শুধুমাত্র সুনামভিত্তিক স্বার্থ আদায় করে নিতে চান, তাদের দ্বারা ভোগভিত্তিক স্বার্থবাদীদের তুলনায় জনস্বার্থ লংঘিত হয় অনেক কম।

আর এ ন্যায়-নীতির আওতায় জনস্বার্থ সুরক্ষিত থাকার সত্যিকার রক্ষাকবজ শুধুমাত্র ঐসব ব্যক্তিদের কাছেই পাওয়া যেতে পারে, যারা ইহলৌকিক স্বার্থের চেয়ে পারলৌকিক স্বার্থকেই বড় করে দেখেন। পারলৌকিক স্বার্থই একমাত্র কাম্য।

আর এ সুতীক্ষ্ণ ন্যায়-নীতিবোধ, Honesty বা সাধুতা জাগ্রত হওয়ার প্রধান মাধ্যমই হলো ধর্মীয় অনুভূতি, আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধি-বিধান তথা পরলোকের প্রতি গভীর আস্থা। এ গভীর বিশ্বাসই শুধু মানুষকে সততার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে সক্ষম। আমাদের দেশের একজন প্রবীণ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা বলেছেন, "Honesty without efficiency is worthless: Efficiency without honesty is dangerous." এ মহান উক্তির সত্যতাকে ব্যাখ্যা করে বলার আর প্রয়োজন পড়ে না।

সুতরাং এ আলোকে আজ আমাদেরকে সমাজের সর্বস্তরে Efficiency-র পাশাপাশি Honesty অর্জনেরও পূর্ণ সাধনায় নিয়োজিত থাকা ও সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো একান্ত আবশ্যক। আর যেদিন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে শুরু করে সর্বস্তরের সামাজিক দায়িত্ব এসব দ্বি-ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে তুলে দিতে পারা যাবে, সেদিনই সাধিত হবে সত্যিকার জনকল্যাণ। বয়ে আনবে মানবতার মুক্তি, অনাবিল সুখ ও শান্তি।

কি করে ভাল আশা করেন

সন্তানের মঙ্গল চিন্তায় ব্যতিব্যাস্ত নন, এমন পিতা-মাতা খুঁজে পাওয়া ভার। ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই ধনী-গরীব, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে প্রত্যেক পিতামাতারই সন্তানদের ঘিরে একটি প্রসারী পরিকল্পনা গড়ে উঠে। সন্তানদের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার মানসে তাদের কর্ম প্রেরণা ও কর্মস্পৃহার বিকাশ ঘটে এবং পারিকল্পনা মোতাবেক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্রতে সার্বিক চেষ্টা ও কর্ম তৎপরতায় নিয়োজিত থাকেন। পাছে অমংগল আশংকা বা যখনই তাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় ছেদ পড়ে, তখনও হতাশা ও দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। আসন্ন অমঙ্গল থেকে উদ্ধার করে তাদের জীবনকে কল্যাণময় করে গড়ে তুলতে আরো তীক্ষ্ম ও প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে উঠেন, চেষ্টার সর্ববিধ হস্ত প্রসারিত করে তোলেন।

কিন্তু পিতামাতা তথা অভিভাবকদের সচেতন দৃষ্টি ও সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আজকে আমাদের সমাজের প্রতি যদি দৃষ্টি দেই, তবে অধিকাংশ কিশোর, ছাত্র, যুবকদের বর্তমানে যে অবস্থা, তারা যে প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠছে, তা রীতিমত আশংকাজনক। শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা, অপরাধপ্রবণতা ও হতাশাগ্রস্ততা যে হারে বাড়ছে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায়-মহল্লায় তাদের যে অশুভ তৎপরতার মহড়া চলছে, তা বর্তমানতো বটেই, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। এসব সোনার সন্তানরা পিতা-মাতা তথা অভিভাবকদের আদেশ-নিষেধের গণ্ডি অতিক্রম করে নিজেদের স্বেচ্ছাচারিতার গণ্ডিতে আবদ্ধ। যত্রতত্র তাদের যাচ্ছে-তাই স্বভাবই আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে, অপরাধ জগতের নব নব সংস্করণ তারা রপ্ত করছে।

অভিভাকরা সন্তানদের এ পরিণতি লক্ষ্য করেও আজ উত্তাল তরংগে হালছাড়া নাবিকের মত অবস্থায়। দুঃস্বপ্নের মোহ ভেংগে তাঁদের কাছে ক্ষীণ ও

ম্লান দৃষ্টি বৈ আর কিছু গোচরিভূত হচ্ছে না। ব্যর্থতা ও হতাশার অক্টোপাসে আজ তারা বন্দী।

সার্বিক চেষ্টার ব্যর্থতায় অধিকাংশ পিতামাতাই আজ দায়সারাগোছের হয়ে পড়েছেন। তাঁদের সন্তানদের অপকীর্তির জবাব হচ্ছে, "কি আর করবো, সাধ্যমত চেষ্টাতো করেছি– পারিনি। কলির যুগ, এ যুগে সন্তানদের মঙ্গল চাওয়াও বোকামি। আল্লাহ তাদের কপালে যা রাখছেন, তা-ই হচ্ছে এবং হবে।" আর এক শ্রেণীর অভিভাবক আছেন, যাদের প্রেষ্টিজ ও বাহুবল একটু টনটনে। অপকর্মের হোতা, কুলাংগার সন্তানদের আচ্ছামত শায়েস্তা করা যাদের স্বভাব। সমাজে নিজের পরিবারের মুখ রক্ষার্থে এ শ্রেণীর অভিভাবকরা সন্তানদের শায়েস্তা বা গৃহছাড়া করে সফল অভিভাবকের প্রমাণ করে থাকেন। কেউবা আরো দু'এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে আদালতে এফিডেভিটের মাধ্যমে ত্যাজ্য ঘোষণা করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সমাজে কুখ্যাত সন্তানের যোগ্য পিতা বলে নিজেকে জাহির করে থাকেন।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, দু'শ্রেণীর অভিভাবকদেরই টার্গেট হল সন্তান। সন্তানই তার অপকর্মের জন্য, তার ভবিষ্যৎ ধ্বংসের জন্য দায়ী। সন্তানকে দায়ী করেই তারা ক্ষান্ত আর সন্তানের উপরই সার্বিক চেষ্টা তদবির চালিয়ে অবশেষে ব্যর্থতায় কেউ বা হাল ছেড়ে দিয়ে, কেউ বা আবার চরম প্রতিশোধ নিয়ে সকল অভিভাবকত্ব যাচাই করে থাকেন। কিন্তু একবারও কি এসব অভিভাবকরা ভেবে দেখেছেন, সন্তানদের এ পরিণতির জন্য সন্তানরা আসলে কতটুকু দায়ী!

অভিভাবকশ্রেণী এ কথাটা বুঝতে চান না যে, একটি শিশু অপরাধী বা আদর্শবাদী হয়ে সমাজে জন্ম গ্রহণ করে না। ভাল মন্দ, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কিত কোন ধারণাই শিশুদের থাকে না। বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবার ও সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থাই শিশুদের ভালমন্দের ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকে। পরিবার ও সমাজের মানুষদের সার্বিক আচার-আচরণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিনোদন পদ্ধতিকে অনুসরণ করেই শিশুরা বিকশিত হয়ে নিজেদের মনমানসিকতা গড়ে তোলে।

এ চরম সত্যটিকে অনুধাবন করতে না পারার ব্যর্থতাই সন্তানদের অধঃপতন হেতু নির্ণয় এবং অধঃপতন থেকে তাদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ।

আমাদের সমাজেও আজ যা চরম সত্য, তা হলো, আমরা আমাদের পরিবার, সমাজ তথা পারিপার্শ্বিক অবস্থার যে শ্রী ঘটিয়েছি, যে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বিনোদনের লালন-পোষণ করছি, সে পথ ধরেই আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

বংশধরেরা এগিয়ে যাবে, সেভাবেই তারা নিজেদের বিকশিত করে তুলবে, চিন্তাচেতনা গড়ে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক ও চিরন্তন সত্য। এর বিপরীত কোন কিছু আশা পোষণ বা চিন্তা করা যেমনি অযৌক্তিক, তেমনি অন্যায়মূলকও বটে।

আমাদের পরিবার, সমাজ, শিক্ষা সংস্কৃতি ও বিনোদন পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করে অভিভাবকদের ভেবে দেখার প্রয়োজন যে, এই পরিবেশে আমরা সন্তানদের কাছে কতবড় অন্যায় অপ্রাসংগিক আশা পোষণ করছি। বাস্তবতার বিপরীত আশা পোষণ; আশার ব্যার্থতায় একতরফাভাবে তাদের দায়ী, অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বসা অথবা অমানুষিক নির্যাতনের পথ বেছে নিয়ে সফল অভিভাবকত্বের মহড়া, এসব শুধু অভিভাবকত্বের দাবী নিয়েই করা সম্ভব যুক্তি ও বিচারের মানদণ্ডে তা মোটেই সম্ভব নয়। কারণ, সন্তানদের কাছে আমরা যা আশা করছি তার সফল ক্ষেত্র তথা পরিবেশ তাদের উপহার দিতে পারিনি। আমাদের ব্যর্থতাই যে তাদের ব্যর্থতার কারণ একথা অকপটে স্বীকার না করার কোন যুক্তি নেই।

শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রতি যদি দৃষ্টি দেই তবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা- যা শিশুদের সৎ, যোগ্য ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে এক পরীক্ষিত মাধ্যম হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। যেখানে দুনিয়ার আইনের ভয় নেই, শাস্তির ভয় নেই, সেখানেও মানুষ শুধু ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা তথা আল্লাহ্‌র ভয়েই সর্বপ্রকার অপরাধ থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হয়ে উঠে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের জন্য এ শিক্ষা একান্ত আবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অধিকাংশ পরিবারে আজ সন্তানদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার দীক্ষা দেয়া হচ্ছে না। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতেও ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার চর্চা নেই। যেখানে যৎসামান্য যা আছে তাও তুলে দেয়ার অপচেষ্টা চলছে। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাকে বিতাড়িত করে আমরা ব্যক্তি, পরিবার তথা সমাজের সর্বস্তরে পাশ্চাত্য ভোগবাদী ও নাস্তিক্যবাদী শিক্ষার চর্চা করছি, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছি। সুতরাং ধর্মীয় ও নৈতিক জ্ঞান বর্জিত আমাদের সন্তানেরা শুধুমাত্র ভোগবাদী, নাস্তিক্যবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্ট মানুষকে বানরের বংশজাত বলে জানার পর বাঁদরামী করবে না তো করবেটা কি?

বিনোদন ও সংস্কৃতির নামে আজ সমাজের সর্বত্র চলছে উলংগপনা, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার সয়লাব। রেডিও, টেলিভিশন ও সিনেমার মত সফল প্রচার মাধ্যমগুলোতে যৌন আবেদনমূলক অশ্লীল নৃত্য-গীত, নাটক ও ছায়াছবিগুলোতে অপরাধ জগতের সর্বাধিক কলাকৌশল আর প্রেমের রিহার্স্যাল ব্যতীত কিশোর, যুবকদের শিক্ষনীয় আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায় অবাধে চলছে বিসিআর আর ব্লু ফ্লিমের দৌরাত্ম। গড়ে

উঠেছে অসংখ্য ভিডিও ক্লাব। সাহিত্য চর্চার নামে অবাধে চলছে অশ্লীলতার চর্চা। অশ্লীল সাহিত্য-পত্র পত্রিকায় আজ বাজার ছেয়ে গেছে। বই পুস্তকের দোকান, ষ্টল, ফুটপাত, পাড়ায়, মহল্লায় যত্রতত্র অশ্লীল ছবি সম্বলিত যৌন আবেদনপূর্ণ সহস্র রকমের ম্যাগাজিন, বই পুস্তক ও পত্র পত্রিকায় ভরপুর। লেখার উপকরণ কলম পেন্সিলের উপরও উলংগ নারীর ছবি এঁটে দেয়া হচ্ছে। ভিউ কার্ডের নামে ফুটপাতগুলো নগ্ন ছবিতে ভরপুর। আফিম, মদ, গাজা, হিরোইনের ব্যবসা অবাধে চলছে। শহর-বন্দর, গ্রামে-গঞ্জে যাত্রা-থিয়েটারের নামে চলছে উলংগপনা, বেহায়াপনার ছড়াছড়ি। সরকারী আনুকল্য ও ছত্রছায়ায় সেফটি বাল্ব-এর এর নামে অবস্থান রয়েছে বহু সংখ্যক পতিতালয়ের এছাড়াও পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায় অভিজাত আবাসিক এলাকা তথা শহরের হোটেলগুলোতে বেহিসেবি গোপনীয় পতিতালয়ের সংখ্যা কত তার হিসেব নেই।

এই যদি হয় আমাদের সমাজের চিত্র, এই যদি হয় আমাদের শিক্ষা, বিনোদন ও সংস্কৃতির রূপ- তবে এই সমাজ, পরিবেশ আবহাওয়ায় লালিত কিশোর ছাত্র, যুবকদেরকে এর বিষাক্ত ছোবল থেকে মুক্ত রাখার চিন্তা বা আশা করা হাস্যকর ও লজ্জাকর বৈ আর কি হতে পারে!

আমাদের সন্তানরা যদি সরকার অনুমোদিত নাটক, সিনেমা ভিসিআর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রেম নিবেদনের সফল রিহার্স্যাল পেয়ে বাস্তবে তার চর্চা করে, অবাধ মেলামেশার সুযোগে স্কুল, কলেজ, রাস্তা-ঘাট, যত্রতত্র পরস্পর প্রেম নিবেদনে মেতে উঠে; শিক্ষার প্রতি উদাসীন হয়ে প্রেমের স্বর্গ রচনায় লাইলী-মজনু, শিরি-ফরহাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, কেউবা আবার ব্যর্থ হয়ে হত্যা, আত্মহত্যা ও এসিড নিক্ষেপের মত লোমহর্ষক ঘটনা ঘটিয়ে বসে, পাঠ্য পুস্তক ছেড়ে দিয়ে অশ্লীল সাহিত্য, পত্র-পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক সাজে, মদ, গাঁজা, সিগারেটের সেবক হয়ে বসে, পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায় মাস্তান সেজে মাস্তানী করে, মাস্তানী ও রোমিও সাজার অর্থ যোগাতে না পেরে চুরি, ডাকাতি ও হাইজ্যাকের পথ বেছে নেয়, তবে এসব অপকর্মের নেপথ্যে কি সন্তানরাই দায়ী? আর আমরা যারা সমাজে এসব অপকর্মের গাউড-লাইনের স্বীকৃতি ও অনুমোদন দিয়ে যাচ্ছি তারা নির্দোষ?

কেউ হয়তো বলে বসবেন, ওরা এসব নোংরামির দিকে যাবে কেন? এ প্রশ্নটা একদিকে যেমনি বিড়ালকে 'দুধ খাসনে' বলার মত, অন্যদিকে বলা যায়, সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে নোংরামির দিকে আহ্বান করার মত শত সহস্র পথ-পদ্ধতি আমরা খুলে রেখেছি। কিন্তু তা থেকে বিরত রাখার আমরা তাদের জন্য

কি করেছি? কিসের আকর্ষণে ওরা এপথ থেকে ফিরে আসবে, কিসে তাদেরকে এ খারাবি থেকে বিরত রাখবে? এসব কচিপ্রাণ সন্তানেরা কি সর্বনাশ নিজেদের করছে তা যদি বুঝতো, এ আত্মহনন থেকে বেঁচে থাকার এতটুকু জ্ঞান ও মানসিক শক্তি যদি তাদের থাকতো, তবে অবশ্যই তারা কোনদিন এ বিষাক্ত পথে পা বাড়াতো না। কিন্তু সর্বশান্ত হয়ে যখন বুঝতে সক্ষম হয়, তখন আর কিছু করার থাকে না।

এ জঘন্য অধঃপতিত সমাজ থেকেও যে কিছু কিছু সন্তান আদর্শ ও ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে পড়ে উঠছেনা তা নয়, এবং তা সম্ভব হয়ে উঠছে কিছু কিছু পরিবারে পারিবারিক পরিবেশে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার চর্চা, আদর্শবান পিতা-মাতার সন্তানদের প্রতি বিজ্ঞোচিত সিদ্ধান্ত ও প্রভাব এবং পারিবারিক পরিবেশকে অশিক্ষা-কুশিক্ষা, অপসংস্কৃতি ও অশ্লীলতা চর্চার সর্বপ্রকার বাহন থেকে মুক্ত রাখার কারণে। পারিবারিক পরিবেশে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় উদবুদ্ধ এসব সন্তানদের বাহিরের কলুষতা খুব কম ক্ষেত্রেই আক্রান্ত করতে সক্ষম হয়ে উঠে। যার ফলে আজও সমাজে কিছু কিছু আদর্শবান সন্তানদের বিচরণ এ জঘণ্য পরিবেশেও অব্যাহত রয়েছে।

আজকের এ আলোচনা ও বাস্তবতার আলোকে সন্তানের মংগলকামী পিতা-মাতা তথা অভিভাবকদের বুঝতে হবে, সন্তান তার সর্বনাশের নেপথ্যে দায়ী নয়। সাধারণ দৃষ্টির অন্তরালে মানুষ নামক এক শ্রেণীর কুলাংগারদের বিকৃত রুচি ও চিন্তার বহিঃপ্রকাশের বিষক্রিয়ায় আজ আমাদের সোনার সন্তানদের এ পরিণতি– সমাজ ও পরিবেশের এ অধঃপতন। এর পিছনে রয়েছে এক গভীর ষড়যন্ত্র ও নীল নক্সার বাস্তবায়ন। এসব বিকৃত রুচি ও চিন্তার নায়কদের হাত থেকে যত তাড়াতাড়ি এ সমাজকে মুক্ত করা যাবে, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অপসংস্কৃতি ও অশ্লীলতাকে ঝেটিয়ে বিদায় করা সম্ভব হবে, তত তাড়াতাড়ি আমরা এ সমাজ, পরিবেশ ও আমাদের বংশধরদের জন্য বয়ে আনতে পারবো কল্যাণ এবং সেটাই হবে সন্তানের প্রতি সত্যিকার মঙ্গল কামনা ও ভালোবাসা। আমরা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভালোভাবে সম্পাদন করলেই মাত্র ভালো ফল আশা করতে পারি, নতুবা নয়।

▲▲▲